মানব মন

প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা
এপ্রিল ১৯৬২

●

এ সংখ্যায় লিখেছেন ঃ

আই. পি. পাভলভ
ইউ. আখ্‌মেরভ
ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
দ্বিজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়
মোহম্মদ আব্দুল করিম
প্রমোদ সেনগুপ্ত
মানসী দাসগুপ্ত
ডাঃ জ্যোতির্ময় শর্মা প্রমুখ

●

মনোবিজ্ঞান - জীববিজ্ঞান - সমাজবিজ্ঞানের আধুনিক ধারা পরিচায়ক ত্রৈমাসিক পত্র

মানব মন প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা এপ্রিল ১৯৬২

সম্পাদকীয় উপদেষ্টামণ্ডলী

ডাঃ রুদ্রেন্দ্র কুমার পাল
ডাঃ সুধীন বন্দ্যোপাধ্যায়
ডাঃ অজিত দেব
ডাঃ সন্তোষ দাস
ডাঃ সন্তোষ বোস
ডাঃ বিনয় ভট্টাচার্য
ডাঃ নরেশ গঙ্গোপাধ্যায়
ডক্টর অরুণা হালদার
ডক্টর জানকীবল্লভ ভট্টাচার্য
শ্রীগোপাল হালদার
শ্রীতরুণ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
ডাঃ জ্যোতির্ম্ময় শর্ম্মা
ডাঃ সোমনাথ মুখার্জি

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়
পাভলভ পরিচিত (৪)—ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৭৬ ৭৩
দশচক্রের গবেষণা —মানসী দাশগুপ্তা ৭৮
শেরিংটনের ভাববাদী চিন্তা সম্পর্কে —আই. পি. পাভলভ ৮০
আধুনিক উপন্যাসে বিভ্রান্তি ও আতঙ্কের সুর —সমালোচক ঘোষ ৮১
মনরোগের কারণ নির্ণয় (৩) —মনোবিদ ৯৩
মানসিক ক্রমবিকাশ —দ্বিজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় ১০০
জাতির মানসিকতার রূপায়ণে ইতিহাসের ভূমিকা (১) —মোহম্মদ আবদুল করিম ১০৪
পাভলভ ও বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ — ১০৯
জীবনদর্শন ও চিকিৎসা বিজ্ঞান —ইউ আখ্‌মেরভ ১১২
আমেরিকার স্কুলশিক্ষায় প্রয়োগবাদের ফলাফল —প্রমোদ সেনগুপ্ত ১১৭
পুস্তক সমালোচনা —ডাঃ জ্যোতির্ম্ময় শর্ম্মা ১২৬

মানব মন

নিয়মাবলী

১। মানব-মন ত্রৈমাসিক পত্রিকা। প্রতি বৎসর জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই ও অক্টোবর মাসে ইহা প্রকাশিত হয়।

২। প্রতি সংখ্যার মূল্য ১৲ টাকা। সডাক প্রতি সংখ্যা ১·২০ নয়া পয়সা।
বার্ষিক গ্রাহকগণের ক্ষেত্রে সডাক ৪৲ টাকা অগ্রিম দেয়। *

৩। চেক্, ড্রাফট, পোষ্টাল অর্ডার, মণি অর্ডার ইত্যাদি PAVLOV INSTITUTE & HOSPITALS এই নামে প্রদেয়।

৪। এজেন্সি বা ব্যবসায় সংক্রান্ত শর্তাদির জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন :—

সুভাষ রায়, কর্মসচিব
মানব মন
১৩২/১এ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৪

---

* '৬২এপ্রিল সংখ্যা হইতে বার্ষিক গ্রাহকগণের ক্ষেত্রে দেয় সডাক চাঁদা ০·৮০ নঃ পঃ হ্রাস করিয়া কেবলমাত্র ৪৲ নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। পুরাতন গ্রাহকগণের নিকট হইতে অগ্রিম পাওয়া ০·৮০ নঃ পঃ পরবর্ত্তী বৎসরের দেয় চাঁদার সহিত যুক্ত করিয়া লওয়া হইবে।

প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্ত পরিষ্কার করবে !

যে অসংখ্য কোষের সমবায়ে শরীর ও মস্তিষ্ক গঠিত হয়, রক্ত প্রবাহের মাধ্যমেই তারা পুষ্টিলাভ করে ; তাই রক্তকে প্রাণরক্ষার প্রধান উপাদান বলা হয়। সেই রক্তই যখন দূষিত হয়ে পড়ে, তখন স্বভাবতঃই বিবিধ কঠিন ব্যাধির আক্রমণে জীবন দুর্ব্বিষহ হয়ে ওঠে।

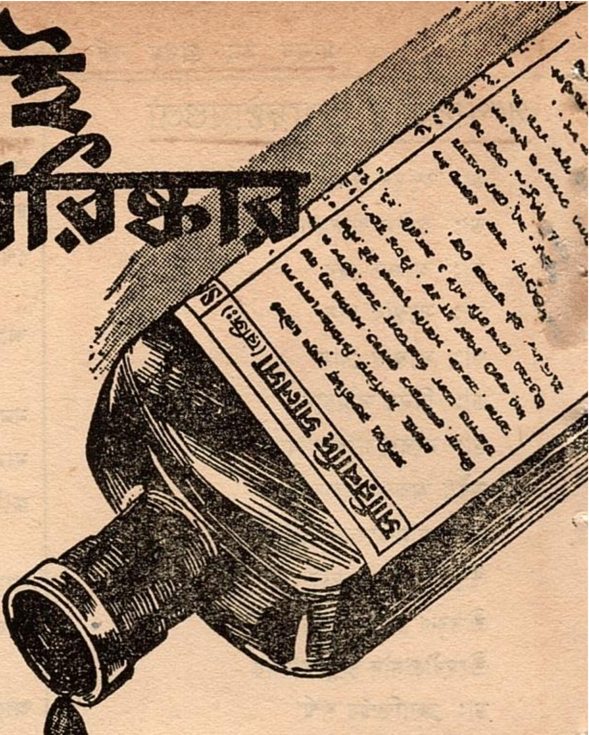

সারিবাদি সালসা প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী যাবত জগতের সর্ব্বত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রক্ত শোধক মহৌষধরূপে প্রসিদ্ধ। সারিবাদি সালসা সেবনে নিয়মিত কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, খোস, পাঁচড়, দুষ্ট ক্ষত, একজিমা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ চর্ম্মরোগ, বাত ও রক্তে জীবাণু সংক্রমণজনিত সমস্ত কঠিন রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হয়, লিভারের ক্রিয়া স্বাভাবিক হয়, ক্ষুধা বৃদ্ধি পায় এবং শরীরে প্রচুর বিশুদ্ধ নূতন রক্ত সঞ্চারিত হয়।

সারিবাদি সালসা

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রক্ত পরিষ্কারক মহৌষধ

অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ-সি-এস (লণ্ডন), এম-সি-এস (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র—ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম-বি (কলিঃ), আয়ুর্ব্বেদ-আচার্য্য।
৩৬নং গোয়ালপাড়া রোড, কলিকাতা-৩৭

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা

শাখা ও এজেন্সী-পৃথিবীর সর্ব্বত্র

অল্প পরিশ্রমেই
আপনি যদি
অবসন্ন হয়ে পড়েন
তখন নিয়মিত ব্যবহারে

ভাইনো-মল্ট

প্রাণোচ্ছল টনিক

আপনাকে
উদ্দীপনা দেবে

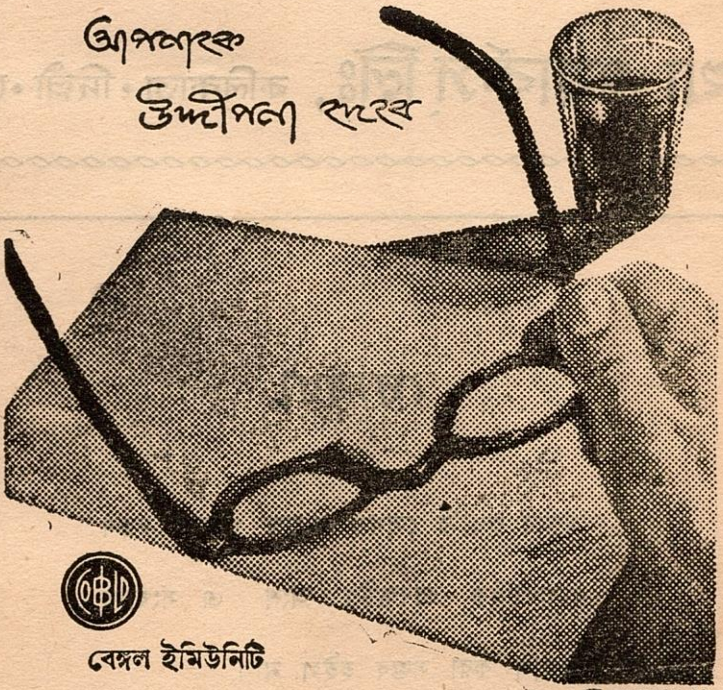

বেঙ্গল ইমিউনিটি

/BI/VM/1-59

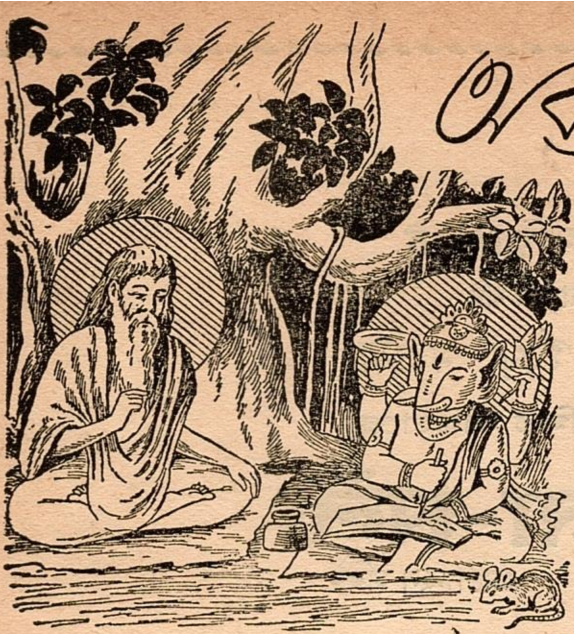

অব্যাহত গতি

একদা মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারত রচনা করিয়া ইহাকে লিপিবদ্ধ করিবার জন্য একজন লেখকের খোঁজ করিতেছিলেন। কিন্তু কেহই এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হইলেন না। অবশেষে পার্বতী-তনয় গণেশ এই শর্তে রাজি হইলেন যে তাঁর লেখনী মুহূর্তের জন্যও থামিবে না।

আধুনিক যুগের লেখকরাও চান যে তাঁদের লেখার গতি কোনক্রমেই ব্যাহত না হয়। আর এই অব্যাহত গতির জন্যই **সুলেখা** আজ এত জনপ্রিয়

(GENERAL) SOL'S-50'

সুলেখা ওয়ার্কস্ লিঃ, কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বাই • মাদ্রাজ

Sulekha
FOUNTAIN
SULEKHA
Sulekha

ঘোষণা

'মনের কথা'র লেখক অসুস্থ থাকার দরুণ ধারাবাহিক প্রবন্ধটির অংশ এ সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হইল না।

সম্পাদক

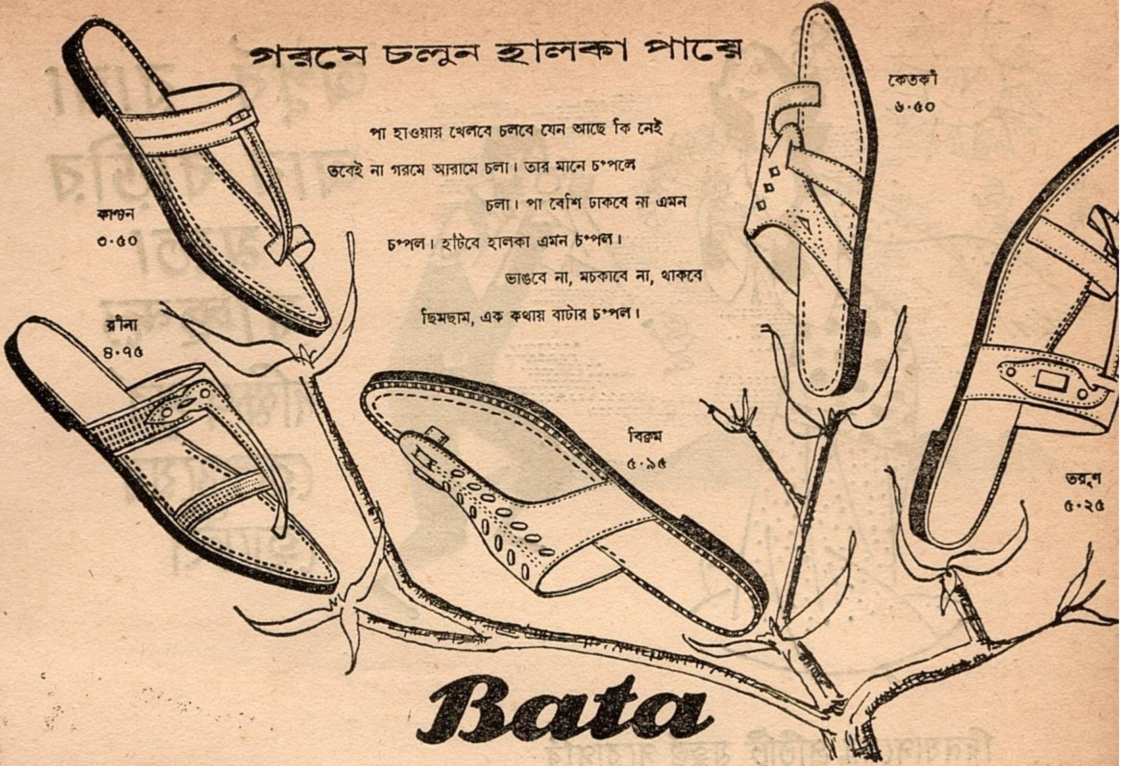
কাঞ্চন
৩·৫০
রীনা
৪·৭৫
বিক্রম
৫·৯৫
কেতকী
৬·৫০
তরুণ
৫·২৫
Bata

গরমে চলুন হালকা পায়ে

পা হাওয়ায় খেলবে চলবে যেন আছে কি নেই
তবেই না গরমে আরামে চলা। তার মানে চ'পলে
চলা। পা বেশি ঢাকবে না এমন
চ'পল। হাটবে হালকা এমন চ'পল।
ভাঙবে না, মচকাবে না, থাকবে
ছিমছাম, এক কথায় বাটার চ'পল।

Bata

রুশ-ভারতী

ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির
পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যশাখার মুখপত্র

সম্পাদক—ডক্টর মহাদেব সাহা

দাম ৭৫ নয়া পয়সা

প্রাপ্তিস্থান :—

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি

কলিকাতা-১২

চতুষ্কোণ

ত্রিমাসিকী আলোচনী

ন্যাশনাল পাবলিশার্স

২০৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

অপূর্ব রান্না আর বাড়ীর মতো স্বাচ্ছন্দ্য

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের হোটেল

দিনযাপনের প্রতিটি মুহূর্ত পুরোপুরি
উপভোগ করতে হলে

রাঁচী

হোটেল

স্থান সংরক্ষণের জন্য দক্ষিণ
পূর্ব রেলওয়ে হোটেলের ম্যানেজারের
নিকট আবেদন করুন
টেলিফোন নং রাঁচী ৪৫

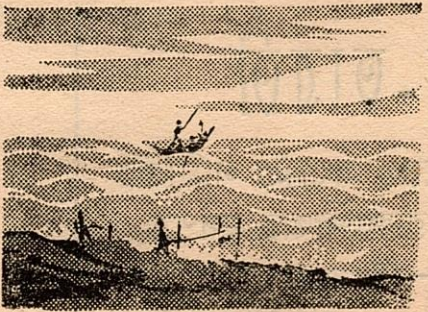

পুরী

হোটেল

স্থান সংরক্ষণের জন্য দক্ষিণ
পূর্ব রেলওয়ে হোটেলের ম্যানেজারের
নিকট আবেদন করুন টেলিফোন নং পুরী ৬৩

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

madison

সম্পাদকীয়

সাম্প্রতিক কালে মানুষ প্রাকৃত বিজ্ঞানের অত্যাশ্চর্য আবিষ্ক্রিয়ার ফলে অভিভূত। তার দৃষ্টি আজ অণু-পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ অমিত শক্তির নিদর্শনে স্তম্ভিত। অদূর ভবিষ্যতে চন্দ্রলোকে মধুচন্দ্রিমা যাপনের কল্পনা আর তার কাছে আকাশকুসুম নয়। অন্তরীক্ষে পাখা মেলে একদিন হয়ত আলোর গতিতে সে বিশ্ব ভ্রমণে বেরিয়ে পড়বে ; সময় স্তব্ধ হয়ে থেমে যাবে—সত্যিই মানুষ হবে কালজয়ী-মৃত্যুঞ্জয়। দিগ্বিজয় ও কালজয়ের কল্পনায় বিভোর আজ মানুষ। জীবন-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে সব যুগান্তকারী নব নব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে ও নতুন দিগন্ত প্রসারিত হয়েছে গেল কয়েক বছরে,—সাধারণের কাছে সে সব অপরিজ্ঞাত না হলেও—তার তাৎপর্য এখনও অনুধাবন সাপেক্ষ। পরমাণুর গঠন ও প্রকৃতি সম্পর্কিত জ্ঞানে মানুষ অসীম শক্তির অধিকারী ঃ সে শক্তিকে আজ মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষীর কবলমুক্ত করে মানব কল্যাণে নিয়োগ সম্ভাবনায় মানুষ আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রকৃতিকে জানবার ও প্রাকৃতিক শক্তিকে বশীভূত করবার প্রচেষ্টা—সাফল্যের তুলনায় জীবকোষ ও জীবনকে জানা ও নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা লাভে মানুষ অনগ্রসর ভাবলে ভুল হবে। জীববিজ্ঞান আজ আর শুধু বিবৃতিমূলক তালিকা প্রণয়নশাস্ত্র নয় ; মনোবিজ্ঞান আজ কেবল অন্তঃদর্শনের ও সাবজেক্টিভ অনুভূতির অনুলেখন মাত্র নয়, সমাজ বিজ্ঞান শুধুমাত্র বর্ব্বর ও পশ্চাদপদ গোষ্টীর আচার-ব্যবহার-বিবাহ বিধির বিবরণসর্বস্ব নয়। জীববিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান আজ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিবরণেই সীমাবদ্ধ নয় ; সূক্ষ্ম ও জটিল পরিবর্তনের পরিমাণ নির্ধারণে সচেষ্ট ও সক্ষম। কার্য-কারণ নির্ণয়েই আজ আত্মসন্তুষ্ট নয় জীববিজ্ঞানী, কারণকে প্রভাবিত করে কার্যকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণের অভিলাসী ও নিয়ন্ত্রণ-সম্ভাবনায় বিশ্বাসী। সমাজবিজ্ঞানীও মনে করেন তাঁর দায়িত্ব শুধু ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করাতে নয়, সমাজের পরিবর্তন সংঘটনের দায়িত্বও তাঁর।

জীববিজ্ঞানের গবেষণাগার আজ অতি-আধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত। কম্প্যুটার, ইলেকট্রনিক ষ্টিমুলেটার, ইলেক্ট্রো-এনসেফালোগ্রাম, গাইগার-মুলার কাউন্টার অতি আবশ্যিক আজ মস্তিষ্কের যে কোন গবেষণাকেন্দ্রে। জীবকোষের বৈশিষ্ট ও বৈচিত্র অনুসন্ধানে টেক্‌নলজির প্রয়োগে ও প্রভাবে জীববিজ্ঞান আজ পরমাণু বিজ্ঞানের, সমপর্যায়ে উন্নীত। পরমাণুর অভ্যন্তরীণ বিন্যাস ও অন্তর্নিহিত শক্তির আবিষ্কার মানুষকে অভিভূত করেছে—নিঃসন্দেহ , কিন্তু জীবকোষের জটিলতা ও বিশেষ করে ডিম্বকোষের (ovum) অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় মানুষের কাছে কম বিস্ময়কর নয়। অতিক্ষুদ্র একটি ডিম্বকোষ ক্রমশঃ কোটি কোটি কোষ-সমন্বিত প্রাণিদেহে পরিণত হয় যে শক্তির প্রভাবে—সে শক্তি কোনো ঐশী বা জীবকোষ বহির্ভূত শক্তি নয়। সে শক্তি ঐ ডিম্বকোষেরই কোটি কোটি বৎসরের বিবর্তন-সঞ্জাত সাধনা-লব্ধ শক্তি। ইলেক্‌ট্রন, প্রোটোন ইত্যাদির সুসম বিন্যাস পরমাণুর বৈশিষ্ট আর নিউক্লিয়াস নিউক্লিওলিয়াস্‌, অন্তঃস্থ ক্রোমোসোম ইত্যাদির সুসম বিন্যাসের ফল জীবকোষ। একই ধরণের জীবকোষের পারস্পরিক আকর্ষণ, বিভিন্ন ধরণের জীবকোষের বিকর্ষণ—আধুনিক কালের এক বিস্ময়কর আবিষ্কার।

অজৈব পদার্থের ক্রমপরিবর্তনে জৈবপদার্থ ও জৈবপদার্থে পরিবর্তন ও বিবর্তনের ফল মানব দেহ। মানব দেহের প্রত্যেকটি আন্তর-যন্ত্রের কর্ম্মক্ষমতা ও সহনশীলতা অপরিসীম। হৃদ্‌পিণ্ডের কথাই ধরা যাক। আধ সেরেরও কম ওজনের এই যন্ত্রটি দিনে একলক্ষবার স্পন্দিত হচ্ছে। একটন ওজনের জিনিষকে ৫০ ফুট উঁচুতে তুলতে হলে যে শক্তি ব্যয় হয়, প্রতিদিন ততটা শক্তি খরচ করেও হৃদ্‌পিণ্ড অক্লান্ত ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিদিন প্রায় ৪০০০ গ্যালন রক্ত পাম্প করে ৬০,০০০ মাইল পরিমিত রক্তবাহী শিরা উপশিরার ভিতর দিয়ে পরিচালিত করে।

মানব মস্তিষ্ক অন্ততঃ ১০ কোটি বছরের বিবর্তনের ফল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞানাহরণকারী ৩ পাউণ্ডের এই মস্তিস্ক নিজেকে জানতে চেষ্টা করেছে মাত্র কয়েক বছর আগে। পাভলভকে মস্তিষ্কের ক্রিয়া প্রক্রিয়ার প্রথম অনুসন্ধানী বলা চলে। পাভলভ-নির্দেশিত পথে ও বার্জার আবিষ্কৃত বিদ্যুৎ তরঙ্গের ছন্দোপূর্ণ মাত্রাচিহ্নের সাহায্যে আজ জীব-বিজ্ঞানের যে সব তথ্য আহৃত ও সংগৃহীত; সে সবের গুরুত্ব পরমাণু শক্তির আবিষ্কার বা মহাশূন্য বিজয়ের গুরুত্বের থেকে এতটুকুও কম নয়। মস্তিষ্কাভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্মজাল-তন্ত্র [Reticular system] ও মস্তিষ্কের উপরিভাগের বল্কল [cortex] পারস্পরিক সহযোগিতার সু-সম কার্যকারিতার ফলে নিয়ত লক্ষ লক্ষ উদ্দীপক আক্রান্ত হয়েও মানুষ ধীর-স্থির ভাবে বিশেষ উদ্দীপককে বেছে নেয়, তাৎপর্যপূর্ণ সাড়া দেয় ও বহির্বাস্তবের জটিল ও সূক্ষ্ম পরিবর্তনের সঙ্গে আন্তরযন্ত্রের সামঞ্জস্যবিধান করে, এবং উদ্দেশ্যমূলক ভাবে জীবন পথে এগিয়ে চলে।

"I should be glad if, when people come to a clear understanding in natural science, they would stick to the truth and not go transcendent again after all has been done in the region of the Comprehenseble"—মহামতি গ্যয়টের এই কথাগুলো আজ সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বুদ্ধি, চৈতন্য; কল্পনা ইত্যাদি মানসিক ক্রিয়া ও সততা, সহযোগিতা, প্রেম, অনুকম্পা ইত্যাদি মানবিক বৃত্তির বাস্তবানুগ সুসম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সম্ভাবনা আজ দেখা দিয়েছে। শুধু তাই নয় সামাজিক ও মানসিক গুণের নিয়ন্ত্রণ এমন কি বংশানুক্রমিকতার ইচ্ছামত পরিবর্তনও অদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের পক্ষে সহজসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। এই সন্ধিক্ষণে সহজ শুভ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করার, comprehensibleকে incomprehensibleএ পরিণত করার ষড়যন্ত্রেলিপ্ত মোহাচ্ছন্ন পণ্ডিতদের প্রচ্ছন্ন ভাববাদ দর্শনের অবৈজ্ঞানিক কূট যুক্তি সম্পর্কে সাধারণকে সতর্ক করা 'মানব মন' সম্পাদক মণ্ডলীর কর্তব্য বলে আমরা মনে করি। আমাদের এই প্রচেষ্টায় ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটলে পাঠকরা চুপ করে থাকবেন না, এই আবেদন পাঠকদের প্রতি।

* * *

ভারতের জাতীয় সংহতি নষ্ট হতে চলেছে। এই প্রক্রিয়ার নানাদিক এবং মূল সমস্যার সঙ্গে জড়িত নানা প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে নানাধরণের প্রবন্ধ প্রকাশিত হবে।

এই সংখ্যায় ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে মোহাম্মদ আব্দুল করিমের লেখা "জাতির মানসিকতার রূপায়ণে ইতিহাসের ভূমিকা" প্রবন্ধটি প্রকাশ করা হইল।

পাভলভ পরিচিতি

[নিস্তেজনা প্রসঙ্গ]

(৪)

—ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

এবার মস্তিষ্ককোশের স্বভাবধর্ম উত্তেজনা-নিস্তেজনার পারস্পরিক সম্পর্ক ও নিস্তেজনা প্রসঙ্গে আসা যাক।

আগেই বলা হয়েছে, শর্তাধীন পরাবর্ত বা কণ্ডিশন্‌ড রিফ্লেক্সের উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন বহির্বাস্তবের যে-কোনও উদ্দীপকের সঙ্গে আনকণ্ডিশন্‌ড রিফ্লেক্সের কালগত সংযোজন। মনে রাখা দরকার বহিরুদ্দীপক আনকণ্ডিশন্‌ড বা শর্তহীন রিফ্লেক্সের থেকে কম জোরালো হবে ও মস্তিষ্কে পৌঁছবে শর্তহীন উদ্দীপকের সামান্য কিছুক্ষণ আগে,—তবেই সহজে শর্তাধীন রিফ্লেক্স গড়ে উঠবে। ঘণ্টার সঙ্গে না হয়ে যদি খুব জোরালো একটা পট্‌কার আওয়াজের সঙ্গে—কণ্ডিশন্‌ড লালা নিঃসরক রিফ্লেক্স তৈরীর চেষ্টা করা হয়,—তবে ব্যাপারটা জটিল ও কঠিন হয়ে ওঠে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ-অবস্থায় কণ্ডিশন্‌ড রিফ্লেক্স তৈরী নাও হতে পারে। খাবার দেবার অনেক আগে যদি আলো দেখাই বা ঘণ্টা বাজাই, তা হলে কোনো কাজ হবে না—শর্তাধীন রিফ্লেক্স গড়ে উঠবে না। তেমনি কোনো কাজ হবে না যদি খাবার দেবার পর, ঘণ্টা বাজাই বা আলো দেখাই। এ-ছাড়া রিফ্লেক্স গড়ার জন্য চাই প্রাণীর সুস্থতা ও মস্তিষ্ক কোশের তৎপরতা।—নতুন রিফ্লেক্স তৈরী একটা যান্ত্রিক ব্যাপার নয়। বিশেষ পরিবেশে থাকলেই সব প্রাণীর উপর পরিবেশের সমস্ত প্রভাব সমান মাত্রায় অনুভূত হবে ও ফলে প্রাণী অর্জন করবে একই ধরণের রিফ্লেক্স বা গুণ- -একথা ঠিক নয়। রিফ্লেক্স তৈরীর শর্তগুলো যথাযথ প্রতিপালিত না হলে রিফ্লেক্স গড়ে উঠবে না। শিক্ষার জন্য চাই যথাযথ প্রস্তুতি।

এইবার রিফ্লেক্স-ক্রিয়া কি কারণে ও কেমন করে ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে একেবারে ভেঙ্গে পড়ে দেখা যাক। আগেই বলা হয়েছে শর্তহীন উদ্দীপক [লালা-নিঃসরণ ব্যাপারে যেমন খাদ্য] ছাড়াই যদি বারবার শর্তাধীন উদ্দীপক[ঘণ্টা] প্রয়োগ করা হয়, অথবা সহসা অনভ্যস্ত ও জোরালো কোনো বহিরুদ্দীপক প্রাণীকে উত্তেজিত করে, তবে রিফ্লেক্স-ক্রিয়ার ঘটবে অবলোপ। অবলোপ ঘটছে কিন্তু রিফ্লেক্স-ক্রিয়া পুরোপুরি এবং চিরকালের মত নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছেনা। মস্তিষ্ক কোশে রিফ্লেক্সের চিহ্ন [Trace] থেকে যায়। শর্তহীন উদ্দীপককের সঙ্গে শর্তাধীন উদ্দীপক দু'একবার প্রয়োগ করলেই —সাময়িকভাবে অবলুপ্ত রিফ্লেক্স পুনরুজ্জীবীত হয়। যখন আপাতঃদৃষ্টিতে রিফ্লেক্সের বহিঃপ্রকাশ দেখছি না, তখন আসলে উত্তেজনার বিপরীত ধর্মী ক্রিয়া নিস্তেজনা উত্তেজিত অংশের সংযোজনে বাধা দিচ্ছে—রিফ্লেক্স ঘটতে দিচ্ছেনা।

গবেষণার ফলে জানা গেছে যে শর্তাধীন সংযোজনের চিহ্ন মস্তিষ্ককোশে অনেকদিন অবধি,

বহিঃপ্রকাশিত না হয়েও—চাপা থাকতে পারে। পুরনো পরিবেশে অল্পায়াসেই একদা আয়ত্ত রিফ্লেক্স বা শিক্ষার উন্মেষ ঘটে থাকে। উত্তেজনা ও নিস্তেজনা এই দুটি বিপরীতধর্মী প্রক্রিয়া স্নায়ুতন্ত্রের স্বভাবধর্ম। উত্তেজনা নিম্নমস্তিষ্ক ও নিম্নমস্তিষ্কের প্রভাবাধীন আন্তর-যন্ত্রাদির ক্রিয়াকলাপের জন্য দায়ী আর নিস্তেজনা এই ক্রিয়াকলাপকে মন্দীভূত করে ও দরকার মত এর অবসান ঘটায়। এই দুটি প্রক্রিয়াই দেহের বিভিন্ন ধরণের অসংখ্য যন্ত্রপাতির বিরামহীন সুষম কর্মপ্রবাহের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। পাভলভ উচ্চমস্তিষ্কের উত্তেজনা-নিস্তেজনা ধর্মের জটিলতার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে এ সম্পর্কে বহু নতুন তথ্যের সমাবেশ করেন ও সন্ধান পান।

'নিস্তেজনা' পাভলভের মতে দুরকমের,—শর্তহীন বা বহিরাগত, শর্তাধীন বা অন্তর্জাত।

পরীক্ষা-নিরীক্ষাকালে যদি প্রাণীর পরিবেশে আকস্মিক কোনো পরিবর্তন ঘটে—শর্তাধীন রিফ্লেক্স সাময়িক ভাবে থেমে যায়—আমরা জানি। জোরালো শব্দ বা আলো, অনভ্যস্ত কোনো দৃশ্য, অচেনা কোনো মানুষ যদি অকস্মাৎ পরিবেশে আমদানী হয় প্রাণীর রিফ্লেক্স সংগঠনে বাধা পড়ে। খাদ্য রিফ্লেক্সের ব্যাপার হলে কুকুর পাত্র থেকে মুখ তুলে নিয়ে—শব্দ, আলোর উৎস, বা অচেনা প্রাণীর দিকে তাকায়—শব্দ করে, লালা নিঃসরণ বন্ধ হয়ে যায়। মানুষের বেলায়ও স্বাভাবিকভাবে এরকমটি ঘটে। ট্রাম রাস্তার পাশে দোতালার ঘরে বসে আমি একমনে পড়ছি বা লিখছি। ট্রাম বাস লরি বাড়ী কাঁপিয়ে কর্কশ শব্দ করে অনবরত যাতায়াত করছে। মনসংযোগ ব্যাহত হচ্ছেনা। এইভাবে মনঃসংযোগে আমি অভ্যস্ত হয়েছি—এইভাবে শর্তাধীন রিফ্লেক্স গড়ে উঠেছে। হঠাৎ বাইরে "চোর চোর" বলে চীৎকার উঠল—অনভ্যস্ত উদ্দীপক অকস্মাৎ আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করল। মনসংযোগ ব্যাহত হল, রিফ্লেক্সটি সাময়িকভাবে ভেঙ্গে গেল। আবার কয়েক মিনিট পরে মনসংযোগ করতে পারলাম। এই নিস্তেজনা ক্রিয়াকে বলা হয় শর্তহীন নিস্তেজনা। এ প্রক্রিয়া প্রজাতির জন্মগত ও স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য।

শর্তাধীন বা অন্তর্জাত নিস্তেজনার কিন্তু স্বভাবগত বা জন্মগত বৈশিষ্ট্য নেই; বিশেষ অবস্থা বা শর্তের উপর নির্ভরশীল। ঘণ্টা বাজানোর সঙ্গে খাদ্য রিফ্লেক্স তৈরী করার পর যদি ঘণ্টা বাজিয়ে যাওয়া হয় ও শর্তহীন উদ্দীপক [এক্ষেত্রে খাদ্য] সরবরাহ না করা হয়, কয়েকবার এভাবে ঘণ্টা বাজানোর পর লালা-নিঃসরণ কমতে কমতে শূন্যের কোঠায় এসে পৌঁছয়। শর্তাধীন নিস্তেজনার উন্মেষ ঘটেছে। যে-উদ্দীপক উত্তেজনা আনছিল—সেই ঘণ্টার শব্দ এখন নিস্তেজনা আনছে। এই শর্তাধীন নিস্তেজনা দীর্ঘস্থায়ী হবে; যদি শর্তহীন উদ্দীপক (খাদ্য) প্রয়োগ না করে আমরা সপ্তাহের পর সপ্তাহ ঘণ্টা বাজিয়ে চলি, অর্থাৎ শর্তাধীন উদ্দীপক প্রয়োগ করতে থাকি। পরিবেশের সূক্ষ্ম পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে নিস্তেজনার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।

মিনিটে একশ স্পন্দনের একটি মেট্রোনমের সঙ্গে যদি খাদ্য -রিফ্লেক্স তৈরী করা হয়, প্রথমটায় ৮০ স্পন্দন বা ১২০ স্পন্দন মেট্রোনমের শব্দে ও রিফ্লেক্স ক্রিয়া ঘটছে দেখা যাবে। এখন ৮০ স্পন্দনের মেট্রোনমটি বারবার উদ্দীপক হিসাবে ব্যবহৃত হল ও তার সঙ্গে শর্তহীন উদ্দীপক [খাদ্য) পরিবেশিত হ'ল না, অথচ ১০০ স্পন্দনের মেট্রনম খাদ্য পরিবেশনের সঙ্গে শর্তাধীন উদ্দীপক হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকল। কিছু পরে দেখা যাবে ৮০ স্পন্দনে খাদ্য রিফ্লেক্স আর ঘটছে না, শুধু ১০০ স্পন্দনেই প্রাণী সাড়া দিচ্ছে।

পরিবেশের সূক্ষ্ম পরিবর্তন, ৮০ ও ১০০ স্পন্দনের তফাৎ প্রাণী মস্তিষ্ক বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়েছে। এই ক্ষমতা আয়ত্তে এসেছে নিস্তেজনা ক্রিয়ার দৌলতে।

নিস্তেজনা মানে উত্তেজনার অভাব বা অনুপস্থিতি মাত্র নয়। প্রাণী ৮০ স্পন্দনে সাড়া দিচ্ছে না মানে এই নয় যে, ঐ উদ্দীপকটি এখন প্রাণীর কাছে অর্থহীন নিক্রিয়। ঐ উদ্দীপক এখন মস্তিষ্কে বিপরীত ধর্মী ক্রিয়া ঘটাচ্ছে যার নাম নিস্তেজনাক্রিয়া। প্রমাণস্বরূপ বলা যায় যে এখন যদি এই উদ্দীপকের সঙ্গে আর একটি শর্তাধীন খাদ্য-রিফ্লেক্স উদ্দীপক যথা ঘণ্টা বাজানো হয়, দেখা যাবে ঘণ্টাধ্বনির দরুন রিফ্লেক্স ক্রিয়ার মাত্রা অনেকখানি কমে গেছে। ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে ৫০ ফোঁটা লালা নিঃসরিত হত; এখন ঘণ্টাধ্বনির ৮০ স্পন্দনের মেট্রনমের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে,—মাত্র ২০ ফোঁটা লালা নিঃসরিত হচ্ছে। ৮০ স্পন্দনের মেট্রনমের নঙর্থক এই ভূমিকার জন্য পাভলভ নিস্তেজক উদ্দীপকের নাম দিয়েছেন নঙর্থক উদ্দীপক।

মস্তিষ্কে সদর্থক [উত্তেজক] ও নঙর্থক [নিস্তেজক] দুই বিপরীত ধর্মী স্নায়ুপ্রক্রিয়ার অস্তিত্ব বিশ্বপ্রকৃতির সর্বত্র যে মৌলিক বৈপরীত্য বিদ্যমান তারই নিদর্শন। উত্তেজনা নিস্তেজনা একই প্রক্রিয়ার দুই ব্যঞ্জনা বা এরা দুয়ে মিলে স্নায়ুপ্রক্রিয়ার সামগ্রিক রূপের অভিব্যক্তি। এই হচ্ছে পাভলভের বহুরকমের পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতালব্ধ অভিমত। একথা অনস্বীকার্য যে উত্তেজনা ও নিস্তেজনার মধ্যে নিয়ত চলেছে সংগ্রাম-এবং এরা বিপরীতধর্মী, আবার এও ঠিক যে এদের উদ্ভব, বিস্তার ও ক্রিয়াপদ্ধতির মধ্যে অনেকাংশে মিল আছে। এ-দুটি প্রক্রিয়াই সর্বদা গতিশীল ও পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত, সক্রিয় ও মূলতঃ সৃজনধর্মী। জটিল ও অজস্র উচ্চতরস্নায়ু প্রক্রিয়া তথা মানসিকতার বহুমুখী ব্যঞ্জনার মূলে আছে এই মৌলিক প্রক্রিয়া দুটি। এরা দুয়ে মিলে একটি সামগ্রিক রূপ নিয়েছে : সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের সাহায্যে নতুন ধর্ম আয়ত্ত হচ্ছে। তা ছাড়া এদের রূপান্তরণও এখানে উল্লেখ্য।

সদর্থক ক্রিয়া অর্থাৎ উত্তেজনা কি করে ক্রমশঃ নিস্তেজনায় রূপান্তরিত হতে পারে, একটু আগেই আমরা দেখেছি। তেমনি জেনে রাখা দরকার শর্তাধীন নিস্তেজনা ও উত্তেজনার মতই সাময়িক ও পরিবর্তনশীল। উৎপাদন ও সংরক্ষণ শর্তগুলির ব্যত্যয় ঘটলে নিস্তেজনা আর নিস্তেজনা থাকে না। স্বকীয় শর্তহীন উদ্দীপক যদি পুনরায় চালু করা হয়, অর্থাৎ পূর্বের পরীক্ষায় ৮০ স্পন্দনের মেট্রনমের সঙ্গে যদি খাদ্য দেওয়া হয়ে থাকে তবে ক্রমশঃ নিস্তেজনা উত্তেজনায় রূপান্তরিত হবে। আবার লালা নিঃসরণ ঘটবে ; ৮০ স্পন্দনের উদ্দীপক কুকুরের সদর্থক উদ্দীপক হয়ে উঠবে। অবশ্য এই রূপান্তরণ যান্ত্রিক ভাবে ও খুব সহজে ঘটবে না। মাত্রাগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্রমশঃ গুণগত পরিবর্তন ঘটবে, যেমনটি ঠিক উত্তেজনা থেকে নিস্তেজনায় রূপান্তরণ ঘটেছিল।

যেমন একটি সদর্থক রিফ্লেক্স থেকে নতুন শর্তসমন্বিত নতুন শর্তাধীন রিফ্লেক্স তৈরী হতে পারে, ঠিক তেমনি নঙর্থক রিফ্লেক্স থেকেও নতুন শর্তাধীন নঙর্থক রিফ্লেক্স তৈরী করা যায়। যাঁরা সার্কাসে জন্তু-জানোয়ারের খেলা শেখান ও খেলা দেখান, তাঁরা জানেন শিক্ষা ও অভ্যাসের ফলে প্রাণী দুটি সঙ্কেতের অতি সুক্ষ্ম পার্থক্যও ধরতে পারে। পাভলভই প্রথম শিক্ষা ও অভ্যাসের আসল তাৎপর্য আবিষ্কার করলেন ও প্রাণীর ব্যবহার বুঝতে আমাদের সাহায্য করলেন। উচ্চমস্তিষ্কের নিস্তজনাক্রিয়ার আবিষ্কার,—যার সাহায্যে প্রাণীর পক্ষে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ সম্ভব—বিজ্ঞানের এক স্মরণীয় আবিষ্কার।

প্রাকৃতিক পরিবেশেও প্রাণী বহুবিধ উদ্দীপকের সঙ্গে শর্তাধীন সদর্থক ও নঙর্থক রিফ্লেক্স গড়তে শেখে ও অনেক সময় সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ক্ষমতার অধিকারী হয়। এইসব রিফ্লেক্স গড়ে ওঠে প্রধানতঃ জীবনধারণ, আত্মরক্ষা ও প্রজাতি সংরক্ষণের তাগিদে ও এই জাতীয় শর্তহীন রিফ্লেক্সকে কেন্দ্র করে। সাধারণ মানুষ ও ভাববাদী মনস্তাত্ত্বিকেরা প্রাণীর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ক্ষমতার ব্যাখ্যায় নানাবিধ অলীক কল্পনার আশ্রয় নিয়ে থাকেন। উল্‌ফ্‌গ্যাং কোহলার, রবার্ট এম্ ইয়েরকস্, কে এম্ ল্যাসলে প্রমুখ পণ্ডিতদের অবাস্তব ও অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে পাভলভের যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য, এঁদের মতবাদ খণ্ডনে বারবার সুনিপুণ তর্কজাল বিস্তার, পাভলভের সংগ্রামী ও আপসহীন মনোবৃত্তির পরিচায়ক। এই বিষয় আমরা বারান্তরে আলোচনা করব। বর্তমানে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে মানুষের চিন্তাধারা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি পশুদের পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়; উত্তেজনা নিস্তেজনার সম্যক জ্ঞান থেকে পশুদের বিশ্লেষনীশক্তির ব্যাখ্যা সম্ভব।

এইবার আর এক ধরনের নিস্তেজনা ক্রিয়ার উল্লেখ করে এ প্রবন্ধ শেষ করব। এতক্ষণ ধরে যে ধরনের নিস্তেজনাক্রিয়ার কথা বললাম, সেই নিস্তেজনা পরিবেশের সঙ্গে যথাযথ ভাবে মানিয়ে নিতে, পরিবেশের বিভিন্ন সঙ্কেতকে ঠিকমত বিশ্লেষণ করতে প্রাণীর পক্ষে দরকার। আর এক ধরনের নিস্তেজনার তিনি সন্ধান দিয়েছেন—যাকে বলা হয় প্রতিরক্ষামূলক নিস্তেজনা বা protective Inhibition. উচ্চমস্তিষ্কের কোশগুলো অতিশয় কোমল ও অল্পেতেই সাড়া দেয়। কাজেই দীর্ঘস্থায়ী অতি উত্তেজনা কোশগুলোর পক্ষে ক্ষতিকর। বিনা প্রয়োজনে উত্তেজনা যাতে না ঘটে প্রকৃতিতে সেইরকম ব্যবস্থা আছে। লক্ষ লক্ষ বছরের সংগ্রাম ও চেষ্টার ফলে এই বিশেষ ধর্ম আয়ত্ত করেছে মস্তিষ্ক। বাইরের সঙ্কেত যদি খাদ্য বা যৌনসঙ্গী যথাযথ ভাবে নির্দেশে অক্ষম হয়, তবে প্রাণী সেই সঙ্কেতে আর সাড়া দেয় না, আমরা জানি। উদ্দীপক তখন উত্তেজনার পরিবর্তে নিস্তেজনা জাগায়। মস্তিষ্ক কোশ বিশ্রাম পায়।

প্রতিরক্ষামূলক নিস্তেজনার সব থেকে পরিচিত উদাহরণ ঘুম। নিস্তেজনাতরঙ্গ মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে—যদি না বাইরের বা ভিতরের কোনো উত্তেজনা দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। সারাদিনের উত্তেজনার অপনোদন ও তদ্দরুন ক্ষয়ক্ষতির পূরণ ঘটায় ঘুম। সুনিদ্রা না হলে নানারকমের শারীরিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। আবার বহুরকমের রোগ উপসর্গ দূর হতে পারে গাঢ় ঘুমের মধ্য দিয়ে। নিস্তেজনার ব্যাপ্তি ও গভীরতা আনে ঘুম।

বলা যায়, ঘুম মানে নিস্তেজনা—গভীর ও ব্যাপক নিস্তেজনা, আবার নিস্তেজনা মানে ঘুম, আংশিক ও সাময়িক ঘুম। পাভলভ বলেছেন—"inhibition is a partial, fragmentary, narrowly limited, strictly localised sleep, confined within definite boundaries under the influence of the opposing process—that of excitation ; sleep on the contrary is an inhibition which has spread over a great section of the cerebrum, over the entire hemispheres and even into the lower lying midbrain…either the inhibition spreads and sleep sets in, or the inhibition is limited and the sleep disappears." পাভলভের এই উদ্ধৃতির মর্মার্থ আগের কয়েক লাইনেই ব্যক্ত হয়েছে।

প্রতিরক্ষামূলক নিস্তেজনা ব্যবস্থা উচ্চমস্তিষ্কের অভিভাবকের কাজ করে। জাগরণ ও ঘুমের মাঝামাঝি একটি অবস্থা আছে—যাকে পাভলভ বলেছেন—সম্মোহিত অবস্থা [hypnoid state]। এই অবস্থায় উত্তেজনাপ্রক্রিয়া নিস্তেজনাকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে বাধা দিতে থাকে, কিন্তু তার শক্তি এত বেশী নয় যে নিস্তেজনাকে একটি কেন্দ্রবিন্দুতে সীমিত করে রাখতে পারে। সীমিত বিন্দুকেন্দ্রিক নিস্তেজনা উত্তেজনার পরিপূরক হিসাবে সুস্থ মস্তিষ্কে বিশ্লেষকের কাজ করে। উত্তেজনা মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের মধ্যে নতুন সংযোজন ঘটায়, কিন্তু এই সংযোজনকে দুটি অতি সূক্ষ্ম বিন্দুর মধ্যে সীমিত করে রাখার জন্য প্রয়োজন বিপরীতধর্মী নিস্তেজনা। মস্তিষ্ককোশের উত্তেজনা ও নিস্তেজনাক্রিয়ার ডাইনামিক ভারসাম্যের উপর নির্ভরশীল প্রাণীর দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য। পাভলভের ভাষায়—"The entire behaviour of the animal is dependent upon the balancing of the excitatory and the inhibitory process, and upon the adaptation of these two to the various agents of the external world" [প্রাণীর সমগ্র ব্যবহার উত্তেজনা ও নিস্তেজনার সমতার উপর ও বহির্বাস্তবের অবস্থার সঙ্গে অভিযোজনের উপর নির্ভরশীল]।

◆

দশচক্রান্তের গবেষণা

মানসী দাশগুপ্ত

সমাজ জীবনে আমরা সকলেই জ্ঞানে, অজ্ঞানে, কোনো না কোনো মূল্যবোধকে আশ্রয় করে থাকি। সে মূল্য কখনো স্পষ্ট আদর্শের আকার নেয়, কখনো বা ঝাপসা মতামতের অন্তরালে থাকে, কিন্তু আমাদের বিচার বুদ্ধিকে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সাহায্য করে তার মাপকাঠি। ভাল, মন্দ, সত্য, মিথ্যা, সমস্ত বিচারের বেলাতেই মাপকাঠির মাপ চলতে থাকে। ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে এ মাপের অল্পবিস্তর তারতম্য ঘটে এ কথা যেমন সত্যি, তেমনি এ কথাও সত্যি যে সে তারতম্যকে অনেকাংশে নির্ধারিত করে সে ব্যক্তির পরিবেশে আর যে দশজন রয়েছে তাদের মতামত এবং রুচির প্রভাব। এই প্রভাবের ফলে আমাদের দেশে জন্মালে যে ছেলে তরুণীর লম্বাবেণী নিয়ে কাব্য করতো, সে ছেলে ডেনমার্কে জন্ম নিলে তরুণীর মাথার দীর্ঘচুলে কোন সৌন্দর্যই দেখতে পায় না। এটি একটি তুচ্ছ, ছোট উদাহরণ, কিন্তু এই একই সত্য বড়ো আকারে স্পষ্ট করে তোলা কিছু শক্ত নয়। মানুষের বিচার বুদ্ধির ওপরে সমাজের পাঁচজনের এই প্রভাব কোথা থেকে এল— এ মৌলিক প্রশ্ন নিয়ে অনেকে অনেক নাড়াচাড়া করেছেন। ঐ রকম গভীরে না গিয়েও শেরিফ (৮) যে প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন তার বিশেষ গুরুত্ব আছে। তাঁর বিশেষ প্রশ্নটি ছিল বিশেষ অবস্থায় জনমতের উপস্থিতি অথবা অনুপস্থিতি এই মূল্যায়নের চেহারায় কী রদ-বদল করে তাই নিয়ে। শেরিফের সে পরীক্ষা বহুদিন ধ্রুপদী মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং সমাজ-মানসের চর্চা নিয়ে যাঁরা আগ্রহী, সে সব পাঠক নিশ্চয় ইতিমধ্যে বহুবার শেরিফের পরীক্ষণের বিবরণ এবং ফলাফল নিয়ে পড়াশুনো আলোচনা করেছেন। তবু সাধারণের বিবেচনার জন্য সংক্ষেপে এ বিষয়ে অল্প বিবরণ দিয়ে নেওয়া ভাল।

একেবারে নীরন্ধ্র অন্ধকার ঘরে একটি স্থির আলোর বিন্দুকে বারবার দেখতে থাকলে সে আলোকে স্বতশ্চল মনে হয়। শেরিফের পরীক্ষার বিষয়টির কেন্দ্রে ছিল এই আলোর স্বতশ্চলন। এর গতিনির্ধারণের জন্য যে মানদণ্ডের প্রয়োজন তা কোন্ অবস্থায় নিরীক্ষকেরা কী ভাবে মনে মনে গড়ে নেন,—লক্ষ্য করবার বিষয় ছিল এই। নিরীক্ষকেরা এসে বসে বসে দেখতেন : আলোটি নড়ছে, এদিকে যাচ্ছে, ওদিকে যাচ্ছে, প্রশ্ন করা হত : আলো কোনদিকে, কতদূর যাচ্ছে? উত্তরে কিছুক্ষণের ভিতরেই দেখা যেত নিরীক্ষকেরা মোটামুটি মাপের একটি মানদণ্ড তৈরী করে ফেলেছেন। তারই সাহায্যে বারবার পরীক্ষাতেও তাঁরা মোটামুটি কাছাকাছি আলোর গতি এবং পাল্লার হিসেব ছকে যাচ্ছেন।

এই পরীক্ষণে শেরিফ যে বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়টি স্পষ্ট করে তুলেছিলেন তা হচ্ছে

এই যে, এই নব নিরীক্ষকদের যদি একা বসে প্রথম দেখতে দেওয়া হয় তাহলে তাঁরা একা-একাই মানদণ্ড তৈরী করেন, যে মাপ পরে অন্য অনেকের সংগে একত্র বসেও তাঁরা সহজে পাল্টাতে চান না। দলবদ্ধ নিরীক্ষকেরা কিন্তু দল বেঁধেই, বলতে গেলে, তাঁদের মাপকাঠি তৈরী করেন (অর্থাৎ তাঁদের প্রত্যেকের মানদণ্ড ক্রমে কাছাকাছি হতে হতে এক হয়ে যায়) এবং সে অবস্থায় তাঁদের একা নিরীক্ষণ করতে দিলে তাঁরা ঐ দলে বসে তৈরী মাপকাঠিই ব্যবহার করতে থাকেন। যদি তাঁদের পুনশ্চ অন্য কোনও দলে বসিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে দলের চাপে তাঁদের মত পাল্টাতে অল্পই বিলম্ব ঘটে। এই ফলাফল থেকে শেরিফ তাঁর সমাজ-মানদণ্ডের তত্ব নির্ধারণে প্রয়াস পেয়েছেন, কিন্তু সে আলোচনা এ প্রবন্ধের মূল বিষয় নয়। শেরিফের পাওয়া এই যে দলমতের প্রভাব,—যার বিশেষ বিশেষ চেহারা সমাজ-জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে সীমাহীন প্রতিষ্ঠা বিস্তার করে থাকে,—আমরা আলোচনা করতে চাই সেই দশের মতের প্রভাব নিয়ে।

এই জনমতের প্রভাবের বিভিন্ন চেহারার কথা বলবার পূর্বে অ্যাশের (১, ২,) সুবিখ্যাত পরীক্ষাগুলির কথাও একটু বলে রাখা দরকার। অ্যাশের পরীক্ষণের ধরণ ধারণ প্রায় শেরিফের পরীক্ষণের মতই, কিন্তু মেজাজে এ দুয়ের প্রভেদ বিস্তর।

অ্যাশ তাঁর পরীক্ষণের মাধ্যমে ব্যক্তির বিচার-বুদ্ধির ওপরে দশের মত ঠিক কী পরিমাণ প্রভাবশীল এই তথ্যটি স্পষ্ট করতে চেয়েছেন। যেখানে বিচারের নির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই সেখানে বিচারবোধ কী ভাবে একা বা দশে মিলে সম্ভব হয়, এ নিয়ে তাঁর কৌতূহল নেই। তাঁর প্রধান ঝোঁক হচ্ছে, দশচক্রে ভগবান ঠিক কী ভাবে কী পরিমাণ ভূত হয়ে ওঠেন, তাই নির্ধারণ করা। বিচারের বিষয়টি অ্যাশ অতিশয় ঘরোয়া রেখেছিলেন: নিরীক্ষকের কাজ ছিল একটি নির্দিষ্ট মাপের রেখার সঙ্গে ঠিক ঐ মাপের আঁকা রেখা খুঁজে বের করে মিল দেওয়া। রেখাগুলি এঁকে দেওয়া হত। এ পরীক্ষায় নিরীক্ষকদের অবস্থার ওলট পালট করে অ্যাশ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় দশের প্রভাব নির্ধারণ করেছেন। কোথাও বিশেষ নিরীক্ষকটি অর্থাৎ যার ব্যবহার দেখে ফলাফল নির্ধারিত হবে, ইংরাজীতে (Critical subject) যা বলছে,—(প্রায় ক্ষেত্রেই ঠিক বলছে) তার সঙ্গী নিরীক্ষকেরা পূর্ব শিক্ষামত সকলে মিলে তা নাকচ করে অন্য মত দিচ্ছে। কোথাও **বিশেষ** নিরীক্ষকটি যা বলছে, তাতে দশের একজন সায় দিচ্ছে, বাকি সবাই ভিন্ন মত প্রকাশ করছে। কোথাও **বিশেষ** নিরীক্ষকটির মতে সায় দিতে দিতে একজন অকস্মাৎ মত পাল্টে বাকি সকলের সংগে একমত হয়ে বসে রইলো। অ্যাশ দেখিয়েছেন যে, এই তৃতীয় অবস্থায় দশের চাপ সবচেয়ে মর্মান্তিক ভাবে কার্যকরী হয়। ওর চেয়ে প্রথম অবস্থায়, অর্থাৎ সকলের বিরুদ্ধে সমানে একা দাঁড়িয়েও মানুষ অনেক সহজে নিজস্ব বিচার ক্ষমতা স্থির রাখতে পারে। তেমনি আবার চতুর্থ একটি অবস্থায়, সকলে সদলে বিরোধী মত দিতে দিতে হঠাৎ একজন দলছাড়া হয়ে **বিশেষ** নিরীক্ষকের সঙ্গে এক মত হয়ে গেলে, দেখা গেছে' **বিশেষ** নিরীক্ষকের নিজের বিবেচনা স্থির রাখার জোর বেড়েছে অনেক বেশি।

অ্যাশ দেখিয়েছেন যে, এই রকম দশচক্রে পড়েও যারা নিজের মত অটল রাখতে

পারে তাদের শুধু আত্মবিশ্বাস বেশি তাই নয়। আরো কিছু চরিত্র-বৈশিষ্ট্যও তাদের আছে। যেমন: তারা অন্য পাঁচজনের মতো আশে পাশের দশজনের দিকে মন দিতে উন্মুখ নয়, তারা কর্মোন্মুখ, তারা হঠাৎ আবেগে কাজ করতে অনিচ্ছুক, ইত্যাদি।

কিন্তু দশের কথায় অল্প বিস্তর সায় দেওয়া যে কেবলমাত্র মানুষের নিজের মেজাজের ওপর নির্ভরশীল নয়, দশের চাপের ধরনের ওপরেও নির্ভরশীল—একথা অ্যাশ তো অবস্থা বৈষম্য ঘটিয়ে দেখিয়েছেনই, পরবর্তী পরীক্ষা নিরীক্ষাতেও [৫, ৭] এ বিষয়ে সমর্থন পাওয়া গেছে। আক্ষেপের কথা এই যে, কী ধরনের আলোচ্য বিষয় নিয়ে বিবেচনা চলছে, এ বিষয়ে বিস্তারিত প্রশ্ন তুলতে সমস্ত সমস্যাটি যে আরও অনেক স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারত, এ কথা গবেষকেরা এখনো যথেষ্ট পরিমাণে খেয়াল করেননি। কেবল দুটি-একটি মন্তব্যে তার ইঙ্গিত মেলে। ক্রাচফিল্ড [৪] কিছুকাল পূর্বে কিছু আলোচনা করে বলেছেন যে নিতান্ত ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে স্বকীয়, মতামত প্রকাশ করা সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু বিচারাধীন বিষয়টি যেখানে সার্বজনীন সেখানে অন্যের মতের দিকে কান যায় সহজে।

এখানে দশচক্র গবেষণার একটি জটিল গ্রন্থি খুলে নেওয়া দরকার। অনেকের এ রকম ধারণা হতে পারে যে, যে কোনও অবস্থাতেই দশজনের মতে সায় দেওয়া মানেই লোকের কথায় নাচা। এতে কিন্তু সমগ্র সমস্যাটিকে অনর্থক ধোঁয়াটে করে তোলা হয়। সায়ের অনেক প্রকার ভেদের ভিতরে অন্ততঃ দুটি ধরন বেশ স্পষ্ট করে আলাদা করা উচিত বলে মনে হয়। যেমন: আমি বললাম, 'চা এনেছি।' আপনি বললেন, 'হ্যাঁ, দিন।" আশা করা যায়, আমি চা আপনার ডানদিকের টেবিলে রাখলে আপনি একসময়ে ডানদিকে ফিরেই সেটি নেবেন। তা না নিয়ে আপনি যদি বাঁ দিকে খোলা মেঝেয় হাত চালাবার চেষ্টা পান, কিংবা, 'চা এনেছি" বলার পরে আপনার যদি উত্তর হয় 'না, আনেননি,'' তা হলে এর দুটো মানে হতে পারে: হয় আপনি রসিকতা করছেন, নয়, আপনার প্রকৃতিস্থ অবস্থায় আপনি নেই। কেন না, ব্যবহারিক জগতে এরকম অসামঞ্জস্য বিধেয় নয়। সেখানে আপনার এবং আমার কতকগুলো ব্যাপারে পারস্পরিক সায় থাকতেই হবে এবং এর মধ্যে কোনও রকম দশের জুলুমের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। যাকে আপনি "পাথর" বলেন, তাকেই আমি, তুমি, সে, সকলে পাথর বলি এবং বলে, এতে কোথাও কারো আত্মপ্রত্যয়ের অভাব ঘটবার আবশ্যক নেই। আমাদের জ্ঞানের জগৎ এমনি করেই তৈরী, সেখানে সত্যের প্রকাশ সামঞ্জস্যে। ওখানে দু-তিনরকমের মত কাছাকাছি থাকবে এরকম ভেবে নেওয়া শক্ত। কিন্তু সামাজিক জীবনযাত্রায় আমরা ওরকম "হ্যাঁ-না" ভাগ-করা কুঠুরীতে বাস করি না, সেখানে অধিকাংশ প্রত্যয় জ্ঞানান্বেষী নয়। আপনি বললেন, "ছোট জাতের বড়ো বাড় বেড়েছে, এইবার দেশ উচ্ছন্নে যাবে, যাচ্ছেও দেখ।" এর উত্তরে প্রকৃতিস্থ থেকেও এবং রসিকতার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে যে কেউ সবিনয়ে আপনার সংগে দ্বিমত হতে পারে, কারণ এটা এমন একটা প্রত্যক্ষ দর্শনের বিষয় নয়, যাতে মতানৈক্য সর্বথা পরিত্যাজ্য।*

---

* এই সব সামাজিক প্রত্যয়কে সত্যাসত্য প্রত্যয়ের পর্যায়ে অবশ্য অনেকে নিয়ে তোলেন, তাঁদের আমরা বলি "গোঁড়া"। কিন্তু এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা এখানে সঙ্গত হবে না।

আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মৌলিক দুটি বিশ্বাস হলো (১) আমরা সামনে উপস্থিত জিনিসকে ঠিক জিনিসটি যেমন তেমনি করেই দেখছি। (২) অন্যেরাও সে-সব জিনিস ঐ ভাবেই দেখছে। এর ভিতরে সকলের পারস্পরিক সমঞ্জস-মতের কথাটা নিহিত, কেননা এখানে মতলব করে কেউ উল্টো কথা বলতে না চাইলে দ্বিমতের সুযোগ এবং সম্ভাবনা নেই। "ঐ দেখ, বৃষ্টি পড়ছে" বলে সঙ্গীর দিকে চেয়ে আমরা যে মতের সামঞ্জস্য খুঁজি—এর সঙ্গে সামাজিক সায় খুঁজে ফেরাকে এক করে ফেলা ঠিক নয়। এদের চরিত্র আলাদা। যদিও মূলতঃ দুয়ের জন্ম হয়ত একই ভাবে : বাল্যের পরনির্ভরতায়। কিন্তু বাল্য পার হয়ে বড় হয়ে আসতে আসতে সাধারণতঃ বুদ্ধিমান লোক এদের ব্যবহার ক্ষেত্র প্রয়োগ পদ্ধতির প্রভেদ বুঝে নেয়। সমস্যা জটিল হয় তখন যখন প্রত্যক্ষ দ্রষ্টব্য পদার্থটি অস্পষ্টতার আড়ালে এমনি আচ্ছন্ন থাকে যে বীক্ষণের চেয়ে অনুমানের ভূমিকা অনেক বড়ো হয়ে ওঠার সুযোগ দেখা দেয়। এই আচ্ছন্ন বীক্ষণে ভুল দেখার সম্ভাবনা যে পরিমাণে বাড়ে, সেই পরিমাণে পাঁচজনের মতে নিজের মত মিলিয়ে দেবার ইচ্ছেও বাড়ে। (ছোট ছেলেদের দলে তর্ক উঠেছে, আকাশে যে শব্দ শোনা যাচ্ছে, এরোপ্লেনটা এই দিকে আসছে না চলে যাচ্ছে? কার কী মত?)

ফেস্টিংগার ১৯৫৪ সালের নেব্রাস্কা সিম্পোজিয়ামে এই ইচ্ছেকে দশের মতে সায় দেবার অন্যতম কারণ বলে নির্দেশ করেছিলেন। কিন্তু এ ইচ্ছে যে মানুষের অন্য লোকের বক্তব্যে নির্ভর করবার সাধারণ অভ্যাসের আবহাওয়ায় লালিত হয়েছে, এ রকম কথা তাঁর মনে এসেছে কিনা. সে সম্পর্কে ফেস্টিংগার তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট করেন নি। কচ সম্পাদিত (৩) পুস্তকে অ্যাশ তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত প্রবন্ধে বলেছেন : একথা মনে রাখা দরকার যে, মানুষ অনতিস্ফুট দ্রষ্টব্য বিষয়ে অন্য লোকের সঙ্গে মত যাচাই করে স্বস্তিবোধ করে তার কারণ হলো এই যে অন্য জিনিস যা সে নিজে কখনো দেখেনি এমন অনেক অতীত এবং বর্তমান বিষয় সম্পর্কেও সে অন্যের মত গ্রহণ করে অনেক কিছু শিখেছে, এবং সে শিক্ষায় তার লাভ বই ক্ষতি হয়নি। এর ফলেই মানুষের অন্যের মতামত বিষয়ে আগ্রহ বেড়েছে। এ বিষয়ে ক্রাচফিল্ডের পরীক্ষণের একটি ফলের কথা মনে করা যেতে পারে। তিনি পেয়েছিলেন যে, তীক্ষ্ণবুদ্ধির সঙ্গে দশের মতে সায় দেবার ঝোঁকের বিপরীত সম্পর্ক আছে। আমরা এতক্ষণ এ বিষয়ে যা জানলাম তাতে এই রকম সম্পর্কই প্রত্যাশিত। কারণ বুদ্ধিমান লোকের এ কথা টের পেতে দেরি হবার কথা নয় যে, জ্ঞানের প্রকাশ যদিও সুসম্মত সঙ্গতিতে, তার অর্থ এই নয় যে যে-কোনও দশজন একবাক্যে কিছু একটা বলতে থাকলেই তা সত্য হবে বা জ্ঞানগর্ভ .হবে। তেমন তেমন দশজনকে বেছে নেওয়া চাই, এবং সে বাছাইয়ের কাজে মানুষের প্রধান সহায় বুদ্ধি।

সামাজিক সায় পাবার চেষ্টায় যে মতৈক্য দেখা যায়, এর মোটামুটি চারটি ব্যাখ্যা অ্যাশের মনে এসেছে : (১) ন্যায়বুদ্ধি ; (২) দলবাঁধার ইচ্ছে ; (৩) অনীহা : (৪) অন্যদের কাছ থেকে সুবিধা আদায় করবার চেষ্টা।

দলমতের প্রভাবে যাঁরা সত্যি সত্যি লম্বাকে বেঁটে দেখেন, মোটাকে রোগা, তাঁদের সম্পর্কে

এগুলি প্রযোজ্য কিনা বলা যায় না। স্পষ্টতঃই তাঁদের ওপরে সামাজিক প্রভাব অতিশয় প্রবল এবং গভীর। কিন্তু ওরকম আন্তরিক পরিবর্তনের চেয়ে বাইরের বক্তব্যের বদল দেখা যায় অনেক বেশি। বাঁড়ুজ্জে মশাইয়ের লরেন্সের লেখা ভাল লাগে না। অথচ বড়ো বড়ো সাহিত্য-সূরীদের দলে বসে তিনি বলে ফেললেন, "লরেন্স? অপূর্ব !!" এ বলার পিছনে অ্যাশ যে কটি সম্ভাব্য প্রেরণার কথা তুলেছেন তার একাধিক বর্তমান থাকতে পারে এবং তদুপরি লোকভয় থাকাও সম্ভব। সামাজিক সায় খোঁজার পিছনে লোকভয়কে কেন এক বিশেষ তাগিদ বলে অ্যাশ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেননি বলা শক্ত।

বাইরের বক্তব্যের বদল যে আন্তরিক পরিবর্তনের কারণ হতে পারে এ নিয়ে কিন্তু ফেস্টিংগার (৬) অতিশয় মূল্যবান প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি কিছুকাল যাবত, এ প্রসঙ্গে কাজ করে দেখেছেন যে, বাইরের ঝুলি পাল্টালে মানুষের বিশ্বাস পাল্টানোর তাগিদ দেখা দেওয়াই স্বাভাবিক। কেননা বিশ্বাস আর বক্তব্য এ দুটি বিপরীত প্রান্তে নীত হলে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তার সুরাহা না করে স্থির থাকা মানুষের পক্ষে কঠিন।

প্রত্যক্ষ জগত-দর্শনী মনে যে দুটি বিশ্বাসের কথা ইতিপূর্বে বলেছি তাতে অসামঞ্জস্য ঘটলে যে দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারত, ফেস্টিংগারের এ দ্বন্দ্ব সে জাতের নয়। কিন্তু সামাজিক সায়-খুঁজে ফেরা মানুষের মনে এ দ্বন্দ্বের গুরুত্ব খুবই বেশি। বাচনে এবং বিশ্বাসে এ সঙ্গতি প্রচেষ্টা কতখানি সার্বজনীন; এ নিয়ে এখনো শেষ কথা বলবার সময় আসেনি। গবেষণা চলছে এবং আরো অনেক গবেষণা চলা দরকার।

প্রবন্ধে উল্লিখিত পুস্তক ও পত্রিকা সূচী

১। অ্যাশ, স, ই—সোশ্যাল সাইকলজি। নিউ-ইয়র্ক : প্রেন্টিস্-হল। ১৯৫২।

২। "এফেক্টস অফ গ্রুপ প্রেশার আপঅন দ্য মডিফিকেশন অ্যাণ্ড ডিস্টরশন অফ জাজমেণ্টস্," রিডিংস ইন সোশ্যাল সাইকলজি। তৃতীয় সংস্করণ। [সম্পাদক : ম্যাকবি, ই, ই, নিউকুম্, টি, ম, হার্টলি, ই, ল।] নিউইয়র্ক : হেনরী হোল্ট এণ্ড কোং। ১৯৫৮। ১৭৪—১৮২॥

৩। কচ, সিগমণ্ড [সম্পাদক]—সাইকলজি—এ ষ্টাডি অফ সায়ান্স-ষ্টাডি ১। তৃতীয় পর্ব। ম্যাক্‌গ্র-হিল। ১৯৫৯।

৪। ক্রাচফিল্ড, র, স,—"কনফর্মিটি" অ্যাণ্ড বিহেভিয়ার" দ্য আমেরিকান সাইকলজিস্ট। ১৯৫৫, ১০, ১৯১—১৯৮॥

৫। ডয়েচ, ম, এবং হ্যারল্ড, ব, গেরার্ড—"এ ষ্টাডি অফ নরম্যাটিভ অ্যাণ্ড ইনফর্মেশনাল সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্স আপঅন ইনডিভিজুয়াল জাজমেণ্ট, "জার্নাল-অ্যাবনরম্যাল অ্যাণ্ড সোশ্যাল সাইকলজি ১৯৫৫, ৫১, ৬২৯—৬৩৬॥

৬। ফেস্‌টিংগার, লি,—এ থিওরী অফ কগনিটিভ ডিসোন্যান্স। রো-পিটারসন এণ্ড কোং ১৯৫৭।

৭। লুডিংটন, চ,—(সম্পাদক) ক্রিয়েটিভিটি অ্যাণ্ড কনফার্মিটি। মানব-ব্যবহার গবেষণা কেন্দ্র, অ্যান আর্বর, মিসিগান। ১৯৫৮।

৮। শেরিফ, ম,—দি সাইকলজি অফ সোশ্যাল নর্মস্। নিউ ইয়র্ক : হার্পার। ১৯৩৬।

শেরিংটনের ভাববাদী চিন্তাধারা সম্পর্কে

—আই, পি, পাভলভ

আমি এবার শেরিংটন সম্পর্কে আলোচনা করব। ইচ্ছা করেই আমি দীর্ঘ সময় নিয়েছি। আমি তাঁর বইখানি বারবার পড়েছি, কারণ কোন রকম ভাসাভাসা ধারণা বা স্থুল বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে আমি কোন অভিমত প্রকাশ করতে চাইনি। কিন্তু দু'সপ্তাহ পরেও আমার প্রথম অভিমত কোন অংশেই পরিবর্ত্তিত হয়নি।

"দি ব্রেন অ্যাণ্ড ইট্‌স্‌ মেকানিজম্‌" বইখানিতে শেরিংটন এমন একটি বিষয় আলোচনা করেছেন যে সম্পর্কে তার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে। সমস্ত জীবনই তিনি একজন বিশেষজ্ঞরূপে স্নায়ুতন্ত্র সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন যদিও স্নায়ুতন্ত্রের উচ্চতর স্তর অপেক্ষা নিম্নতর অংশ অর্থাৎ মেরুদণ্ড তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল।

মস্তিষ্কের গঠন ও কার্য্যপ্রণালীর সূত্রগুলিকে তুলনামূলক বিচার করে তিনি এক অদ্ভুত সিদ্ধান্তে এসেছেন। মনে হয় মস্তিষ্কের সংগে মানবমনের যে সম্পর্ক আছে সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ নন। এটা বিস্ময়কর যে সমস্ত জীবন স্নায়ুতন্ত্র সম্পর্কে গবেষণা করেও একজন স্নায়ু-বিশেষজ্ঞ মস্তিষ্ক ও মনের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্থ। তাঁর এই দ্বিধাগ্রস্থ মনোভাব এখানে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে: "যদি স্নায়ুক্রিয়া মনের সংগে সম্পর্কযুক্ত হয়……।" এই জায়গাটি পড়ে নিজের ইংরেজী জ্ঞান সম্পর্কেই আমার সন্দেহ জেগেছিল। তাই আরও অনেককে এই অংশটি অনুবাদ করে আমাকে শোনাতে বলেছিলাম।

বর্ত্তমান যুগে একজন শারীরবৃত্তবিদ স্নায়ুতন্ত্র ও মন যে সম্পর্কযুক্ত সে বিষয়ে কিভাবে সন্দেহ করতে পারেন? এ হল দ্বয়বাদী ধ্যানধারণার ফল। মস্তিষ্ক হল একটি পিয়ানো, একটি নিশ্চেষ্ট যন্ত্র এবং আত্মা একজন সুরকার। ঐ সুরকারই মস্তিষ্করূপ পিয়ানোতে ইচ্ছামত নানা সুরের ঝংকার তোলে। এই কার্তেসীয় মতবাদের সংগে শেরিংটনের মিল রয়েছে। দ্বয়বাদী শেরিংটন মানুষকে দুটি অংশে ভাগ করেন—পাপের আধার এই দেহ এবং চিরন্তন ও অমর আত্মা। যে কারণেই হোক এই আত্মা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনকেও তিনি সাংঘাতিক অনিষ্টকর মনে করেন এবং তাঁর এই মতটি তিনি পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছেন। আমি এতে সত্যই বিস্মিত হয়েছি। তিনি মনে করেন যে আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিরাও যদি স্নায়ুক্রিয়া সম্পর্কে কিছু জ্ঞান অর্জন করেন তবে তা পৃথিবীর পক্ষে অমংগলকর হবে এবং তার ফলে মানবজাতির বিলুপ্তির সম্ভাবনাও দেখা দেবে। তিনি বলছেন: মানুষ যদি নিজেকে জানতে পারে এবং ঐ জ্ঞানকে ভিত্তি করে নিজেকে প্রয়োজন মত পরিমিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করে (এ ধরণের নিয়ন্ত্রণ

কিন্তু খারাপ নয়, কারণ এতে তার আয়ুষ্কাল আরও বাড়বে) তাহলে "আমাদের এই গ্রহ পুনর্মুক্ত হবে, পশু-প্রাধান্যযুগের ঘটবে পুনর্বিস্তার।" আপনারা কি মনে করেন ? এর অর্থই বা কি ? এ এক উদ্ভট মতবাদ।

যদি স্বীকার করেও নেয়া যায় যে আত্মা ও দেহের সম্পর্ক পিয়ানোবাদক ও পিয়ানোর সম্পর্কের সংগে উপমেয় তবু এ প্রশ্নটি থেকে যায় যে কিভাবে আত্মা সম্পর্কিত জ্ঞান অমংগলকর হতে পারে। কিরূপেই বা ঐ জ্ঞান মানবজাতির বিলুপ্তির কারণ হতে পারে ? সক্রেটিস বলেছেন —নিজেকে জানো। একজন বিজ্ঞানী ; বিশেষ করে একজন স্নায়ুবিশেষজ্ঞ তবে কিভাবে বলেন— সাবধান ! নিজেকে জানতে চেও না। বিস্ময়কর হলেও শেরিংটন দ্যু'বে রেমণ্ড (Dubois Raymond) কর্তৃক একদা—প্রচারিত আদর্শ গ্রহণ করেছেন। রেমণ্ড ছিলেন এমন একজন যিনি বাগ্মীতার প্রয়োজনে অথবা সুন্দর শব্দমালা ব্যবহারের প্রলোভনে সত্যকে বিসর্জন দিতে দ্বিধা করেননি ; যিনি মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ চির অজেয়—'ignorabimus'—এই মত প্রচার করতেন। পঞ্চাশ বছর পরে সেই একই মত শেরিংটন আবার প্রচার করছেন। এর অর্থ কি ?

"যদি স্নায়ুক্রিয়া মনের সংগে সম্পর্কযুক্ত হয়" তবে শেরিংটন মনে করেন যে এই সম্পর্ক শুধু নিস্তেজনার (inhibition) ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। সদর্থকক্রিয়ার কোন মূল্যই দেয়া হল না অথচ নিস্তেজনা ক্রিয়ার সাময়িক বিরতি—তাঁর কল্পিত আত্মার সংগে সুন্দরভাবে খাপ খেয়ে গেল। তিনি বললেন, "যদি স্নায়ুক্রিয়া মনের সংগে সম্পর্কযুক্ত হয় তাহলে আমরা এ কথা অস্বীকার করতে পারি না যে মনের ক্রিয়াকলাপে স্নায়ুপ্রক্রিয়ার এই নিস্তেজনার প্রভাব অনেকখানি।" তাহলে প্রশ্ন ওঠে বুদ্ধিবৃত্তির (intelligence) সংগে অপরিহার্য সদর্থক প্রক্রিয়ার সম্পর্ককে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে শুধু নিস্তেজনা প্রক্রিয়াটিকে স্বীকার করা হল কেন ? ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের মধ্যে যাঁরা শেরিংটনের বইখানি পড়েছেন লেখকের সমর্থনে তাঁরা কি কেউ কিছু বলতে পারেন ? আমি মনে করি এটি কোন রকম ভুলবোঝা, অগভীর চিন্তা বা ত্রুটিপূর্ণ বিশ্লেষণের ব্যাপার নয়। তিনি সুস্থ নন এ কথাই আমার মনে হয়। মাত্র সত্তর বছর বয়সেই তাঁর মধ্যে বার্দ্ধক্যের লক্ষণ পরিষ্কারভাবে দেখা দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ আমার স্ত্রীর কথাই ধরুন। তিনি নিঃসন্দেহে দ্বয়বাদী এবং ঈশ্বরবিশ্বাসী। তবু তার দৃষ্টিভংগি আচ্ছন্ন হয়নি।

সমস্যাটি বুঝবার চেষ্টার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ অথবা এরকম চেষ্টা মানবসমাজের ধ্বংস ডেকে এনে পশুদের জয় সূচিত করবে এ ধরনের চিন্তা কিভাবে সম্ভব ? আমি চাই যে ইংরেজী ভাষায় ভাল দখল আছে এমন কেউ এই বইখানি অনুবাদ করুক। অনেকেই যখন শেরিংটনকে বিশেষজ্ঞ মনে করেন তখন এধরনের অর্থহীন বক্তব্য ছেপে প্রকাশ করার কি প্রয়োজন ছিল ? আমি আপনাদের এই বইখানি পড়ার জন্য এবং সমর্থনে কিছু বলার থাকলে তাও বলার জন্য অনুরোধ করি। আমার কাছে এটি সম্পূর্ণরূপে উদ্ভট মনে হয়েছে।

শেরিংটন যে একজন দ্বয়বাদী ও সর্বপ্রাণবাদী এর প্রমাণ আমি দিচ্ছি। ১৯১২ সালে অর্থাৎ বিশ বছর আগে যখন তাঁর সংগে লণ্ডনে আমার প্রথম দেখা হয় তিনি আমাকে বলে-

ছিলেন; "আপনার শর্তাধীন পরাবর্ত্তের তত্ত্ব ইংলণ্ডে চলবে না। কারণ ওতে বস্তুবাদের গন্ধ আছে।" আমি ধরে নিয়েছিলাম যে তিনি তার নিজের কথাই বলছেন।

আর একটি চিত্তাকর্ষক অংশ উদ্ধৃত করা যাক। "সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে মস্তিষ্ক ও মনের সম্পর্কের প্রশ্নটি যে শুধু এখনো সমাধান হয়নি তা নয়, এরকম কোন প্রচেষ্টা শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তিও গড়ে ওঠেনি।" অর্থাৎ তিনি পরিষ্কারভাবে বলছেন যে সমস্যাটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য ন্যূনতম উপাদানও আমাদের হাতে নেই যা অবলম্বন করে আমরা এগোতে পারি।

কেন জীবনের শেষপ্রান্তে তিনি গোঁড়া দ্বয়বাদ ও সর্বপ্রাণবাদের আশ্রয় নিয়েছেন তার ব্যখ্যা এখানেই পাওয়া যায়।

দেকার্ত্তের (Descarte;) দ্বয়বাদে দেখা যায় তিনি পশুকে নিছক যন্ত্র বলেই বর্ণনা করেছেন। তার সেই ধারণার মধ্যেই আমরা পরাবর্ত্ত তত্ত্বের সন্ধান পাই এবং এই পরাবর্ত্ত তত্ত্বকে ভিত্তি করেই আমাদের স্নায়ু প্রক্রিয়া বিশ্লেষণের কাজ গড়ে ওঠে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে দেকার্তের অভিমত দ্বয়বাদীরই অভিমত। অথচ গুরুত্বসহকারেই তিনি মস্তিষ্কের সংগে পিয়ানোর এবং আত্মার সংগে পিয়ানোবাদকের উপমা দিয়েছেন। তিনি পুরোপুরি বিশ্বাস করতেন যে এদুটির মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ যোগসূত্র নেই। এজন্যই দেকার্তের তীক্ষ্ণ মেধার কাছে এটি একটি জটিল সমস্যা ছিল। তিনি মানুষ ও পশুর মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট ভেদরেখা টেনেছিলেন। আগেকার দিনে সহজ সরল লোকেরা মনে করতেন যে পশুদের কিছুই নেই, যেন শুধু ধোঁয়া; কিন্তু মানুষের একটা কিছু আছে তার আত্মা। আমি যখন রিচেটের (Richet)৩ কাছে এ বিষয়টির উল্লেখ করি তখন ফরাসী চিন্তাধারাকে সমর্থন করার জন্য তিনি বললেন যে ওটি দেকার্তের নিজস্ব মত নয়। ধর্মযাজক সম্প্রদায়ই তাকে বাধ্য করেছিল ওরকম মতবাদ প্রচার করতে। প্রকৃত পক্ষে তিনি আমাদেরই মতে বিশ্বাসী ছিলেন।

জনৈক সভ্য—শোনা যায় দেকার্তে তাঁর সর্বশেষ বইটি বস্তুবাদী চিন্তাধারা অবলম্বনেই লিখেছিলেন এবং সেটি তিনি পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। তিনি ভয় করেছিলেন যে ধর্মযাজক সম্প্রদায় তাঁকে শাস্তি দেবে। দর্শনশাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর মতামতের উপসংহার স্বরূপ তিনি এই বইটি লেখেন।

আই, পি, পাভলভ—আমি এ বিষয়ে কিছু পড়িনি। অবশ্য সেকালে এটা একটি হাল্কা ব্যাপার ছিল না। অনায়াসেই তারা তাঁকে পুড়িয়ে মারতে পারত এটা সত্যি কথা।

এন, এ, পদকোপায়েভ (N. A. Podkopayev)—শোনা যায় যে দেকার্তে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই তার লেখা এমন ভাবে পরিবর্তিত করতেন যাতে সেন্সর কোন দোষ না ধরতে পারে। যা তিনি লিখেছেন এবং যা সত্যই বিশ্বাস করতেন এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য ছিল।

আই, পি, পাভলভ—আমি কখনও একথা শুনিনি। যাহোক, এটুকুই আমার বলার ছিল। আপনাদের মধ্যে যাঁরা ইংরেজী জানেন তাঁদের এই বইখানি পড়তে আমি অনুরোধ করি।

পি, এস, কুপালভ (P. S. kupalcv)—শেরিংটন অবশ্য একজন দ্বয়বাদী। এতে কোন সন্দেহ নেই। এজন্যই বিশেষ কতগুলি শব্দ তিনি যে অর্থে ব্যবহার করেন, আপনি সে অর্থে করেন না।

আই, পি, পাভলভ—তিনি পরিষ্কারভাবে লিখেছেন—"যদি স্নায়ুক্রিয়া মনের সংগে সম্পর্কযুক্ত না হয়—"

পি, এস, কুপালভ—"মন" এই শব্দটি তিনি কি অর্থে ব্যবহার করেছেন ?

আই, পি, পাভলভ—কেবল মাত্র "মন" এই শব্দটিই তিনি ব্যবহার করেছেন।

পি, এস, কুপালভ—কিন্তু "মন" এই বিষয়টি আপনি আপনার নিজস্ব ধরণে ব্যাখ্যা করছেন ; তিনি কিন্তু কিছুটা অন্যভাবে নিয়েছেন। বলা চলে তিনি প্রধানতঃ বিষয়ীগত (subjective) প্রক্ষোভকেই বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে আচরণ নিয়মের অধীন। কিন্তু তার মনে রয়েছে যাকে আমরা বলি প্রাক্ অনুভূতি (near sensation) তাই।

এন, এ, পদকোপায়েভ—এতো আরো খারাপ।

আই, পি, পাভলভ—পদকোপায়েভ্ ঠিকই বলছেন যে এ আরো খারাপ। অনুভূতি স্নায়ুক্রিয়ার সংগে সম্পর্কহীন এ কথার অর্থ কি ? বহির্বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথ অভিযোজন যদি মনের কাজ না হয়, শুধুমাত্র বিষয়ীগত প্রক্ষোভ ও প্রকাশ, যেমন প্রত্যক্ষ অনুভূতি, যদি মনের কাজ হয় তবেই বলা চলে যে অনুভূতির সংগে স্নায়ুতন্ত্র সম্পর্কহীন।

পি. এস, কুপালভ—বইটির প্রথম অংশে তিনি বলছেন যে মন বহির্বাস্তব কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং মানুষের আচরণ ঐ বহির্বাস্তবেরই নিয়ম সাপেক্ষ। এপর্যন্ত ভুল বোঝার কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু শেষ অংশটি আমার কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়েছে। সেখানে তিনি এই প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন : বিশুদ্ধ শারীরবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমি মস্তিষ্ককে পরীক্ষা করি তবে কি পরিচিত স্নায়ুকোষে এমন কোন গুণ আবিষ্কার করব যা অজানা ছিল ? বুদ্ধি (intelligence) নয়, আত্মাকেই তিনি মন বলছেন।

এন, কে. পদকোপায়েভ—সমস্যাটিকে এভাবে দেখাই দ্বয়বাদের লক্ষণ। দুটি জিনিষকে যোগসূত্রে গ্রথিত করতে হলে তাদের পৃথক অস্তিত্ব কল্পনা করা এবং পরস্পরের দূরবর্তী হওয়া প্রয়োজন।

আই, পি, পাভলভ—মন প্রাণী ও তার পরিবেশের মধ্যে পরস্পর নির্ভরশীল এক সূক্ষ্ম সম্পর্ক তার এই মত শারীরবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে সত্য। কিন্তু তাহলে বিষয়ীগত অনুভূতির জন্য আর কি বাকী রইল ? বহির্জাগতিক পরিবেশের সংগে স্থূলসূক্ষ্ম নির্বিশেষে সবরকম সম্পর্ক যদি শারীরবৃত্ত-মূলক এই মস্তিষ্ক ক্রিয়া ছাড়া আর কিছু না হয় তবে "মন" শব্দটির আর অন্য কোন ব্যাখ্যা করার অবকাশই থাকে না। এখানেই হল বৈপরীত্যের মূল কথা।

পি, এস, কুপালভ—তিনি বলেন : আমরা যদি পরস্পরকে গভীরভাবে জানতে পারি তবে জীবন অর্থহীন ও অসম্ভব হয়ে পড়বে।

আই, পি, পাভলভ—আপনার কথা থেকে বুঝতে পারছি, এই সমস্যাটি সমাধানের জন্য কি তীব্র মানসিক যন্ত্রণা আপনি ভোগ করছেন। তবুও আপনার বক্তব্য পরিষ্কার নয়।

পি, এস, কুপালভ্—আমি একে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছি। তার সর্বশেষ বাক্যটির কথা ধরা যাক। সেখানে তিনি বলছেন, "আমাকে ক্ষমা করা হোক……" এবং যা সামাজিক টাইপ সম্পর্কে……

আই, পি, পাভলভ—এ সত্যই মূঢ়তা ! আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সংগে ওর কোন সম্পর্ক নেই। এতে

আরও প্রমাণিত হয় যে আমরা এমন এক ব্যক্তির বক্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করছি যিনি মনের দিক থেকে সুস্থ নন। আপনি তার মতবাদের সমর্থক; কিন্তু বুঝবার সবরকম চেষ্টা করেও তাঁর বক্তব্য আপনার কাছে দুর্বোধ্য থেকে গেছে। এটা আমার মতকেই জোরদার করছে। তিনি একজন গোঁড়া দ্বয়বাদী। আমি আরও অনেক দ্বয়বাদীকে জানি। কিন্তু তাঁরা কখনো এরকম কথা বলেন নি যে মনকে বিশ্লেষণ করলে পৃথিবীতে মানব জাতির বিলুপ্তি ও পশু-প্রাধান্যের সম্ভাবনা দেখা দেবে! পৃথিবীকে মানব-কবল-মুক্ত করার কথাটি সম্পূর্ণ অর্থহীন। এরকম বলার অর্থ এই যে জীবনবিকাশের সর্বোচ্চস্তরে অবস্থিত মানুষ একদল অত্যাচারী জীব। কেবলমাত্র এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে পৃথিবীকে মানব-কবল-মুক্ত করার কথাটি বলার অর্থ হয়।

পি, এস, কুপালভ—মুক্ত করা হবে নতুন করে গড়ে তোলার জন্য।

আই, পি, পাভলভ—"পুনর্মুক্ত হবে, পশু-প্রাধান্য যুগের ঘটবে পুনর্বিস্তার"—না, ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা যদি তাঁকে সমর্থন করতে চান তাহলে তিনি কি লিখেছেন তা অন্ততঃ পুরোপুরি বুঝতে হবে।

পি, এস, কুপালভ—আজকের পৃথিবীতে "পশু-প্রাধান্য" বর্ত্তমান এদ্বারা তিনি প্রাণীর (মানুষ সহ) প্রাধান্য বোঝাতে চাইছেন। পৃথিবীতে কার প্রাধান্য? প্রাণীজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভূ মানুষের।

আই, পি, পাভলভ—যখন তিনি "পশু-প্রাধান্যে"র কথা বলেন তখন পশু অর্থাৎ মানুষের চেয়ে নিম্নস্তরের প্রাণীকেই বোঝাতে চান।

ই, এ, আস্‌রাটিয়ান্—সম্ভবতঃ এটা আরও সহজভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। মনে হয় এখানে (*E. A. Asratyan*) সমস্যাটির সামাজিক দিকটিও বিবেচনা করা হয়েছে। পশ্চিমে স্পেংগলার [৪] এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তির ভাবধারার প্রভাব খুব বেশী। বিজ্ঞানকেও অনেকটা ঐ চোখেই দেখা হয়।

আই, পি, পাভলভ—এটাই তাঁর অসুস্থ চিন্তাধারার পরিচায়ক। তিনি নিঃসন্দেহে দ্বয়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকেই এরকমটি বলেছেন এবং পরে খাপছাড়া ভাবে স্পেংগলার ও আরও অনেককে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন যে মানবসমাজের দ্রুত বিলুপ্তির সম্ভাবনার কথা বুঝবার জন্য আমাদের সত্যদ্রষ্টা হতে হবে না। কিন্তু স্পেংগলার প্রভৃতির বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁরা বলেন যে জীবনের জটিলতার—যার সংগে অভিযোজনে মানুষ অভ্যস্ত নয়—পরিপ্রেক্ষিতে অত্যধিক কাজ মানুষের ধ্বংস ডেকে আনতে পারে। এটি একটি সম্পূর্ণ আলাদা কথা এবং এর সংগে মন ও স্নায়ুতন্ত্রের পরীক্ষানিরীক্ষার প্রশ্নের কোনই সম্পর্ক নেই। অন্ততঃ আমি বুঝতে পারি না। আমার মতে এ কথাগুলি তাঁর অসুস্থ চিন্তার পরিচায়ক। কারণ এখানে প্রশ্নটি হল স্নায়ুতন্ত্র ও মননশক্তির পরীক্ষানিরীক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পরিমিত ব্যবহারের প্রশ্ন। আর স্পেংগলার অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতির কথা বলেছেন।

ই: এ, আস্‌রাটিয়ান্—আমি মনে করি এ প্রশ্নটিও একই কেন্দ্র থেকে উৎসারিত।

আই. পি, পাভলভ—আপনার ইচ্ছা। কিন্তু মূল প্রশ্নটি বিশেষ পরীক্ষার দাবী রাখে। এ

রকম মানসিক যন্ত্রণা যদি দ্বয়বাদের প্রভাবের ফল হয়, তবে তা সমগ্র মানবজাতির পক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এ সম্পর্কে উপযুক্ত বিচার-বিবেচনা করা একান্ত প্রয়োজনীয়……।

বিশেষ ও অপেক্ষাকৃত সীমিত সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা এক রকম। কিন্তু মানবিক বুদ্ধিবৃত্তির সামগ্রিক ধারাকে আশ্রয় করে যে সমস্যার উদ্ভব তার সমাধান খুঁজতে চেষ্টা করাটা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। আমরা অল্পদিন হল দ্বয়বাদের কবল থেকে নিজেদের মুক্ত করার সংগ্রাম শুরু করেছি। দীর্ঘদিন আমাদের চিন্তাধারা দ্বয়বাদী ধ্যানধারণা দ্বারা শৃংখলিত ছিল। এ কথাটা মনে রাখা দরকার।

১। Charles Sherington-এর The Brain and Its Mechanism বইটি ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত হয়। তার পরবর্তী বই Man on His Nature ১৯৪২ সালে প্রকাশিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীর চিকিৎসক ও দার্শনিক J. Fernel-এর ভাববাদী চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করে তিনি ঘোষণা করেন যে এ জগৎ চির অজ্ঞেয়।

২। Dubois-Raymond উনবিংশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত জার্মান শারীরবৃত্তবিদ। "Seven Enigmas of the World" নামক তাঁর এক বক্তৃতায় তিনি বলেন যে বিজ্ঞান মনোজগতের রহস্য উন্মোচন কোন দিনই করতে পারবে না। সেদিন থেকে অজ্ঞেয়বাদী ও ভাববাদীদের মূলমন্ত্র হল "ignorabimus' এই কথাটি।

৩। Richet Charles একজন প্রখ্যাত ফরাসী মনস্তাত্বিক। তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টির অধ্যাপক ও প্যারিস বায়ওলজিকাল সোসাইটির সভাপতি ছিলেন।

৪। Spengler একজন প্রতিক্রিয়াশীল ভাববাদী জার্মান দার্শনিক।

অনুবাদক—পরিতোষ গুপ্ত

আধুনিক উপন্যাসে বিভ্রান্তি ও আতঙ্কের সুর

সমালোচক ঘোষ

উপন্যাসের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে ইদানিংকালে যে পরিমাণ বিতর্ক হয়েছে, সাহিত্যের অপর কোন শাখা নিয়ে তেমন হয়েছে কি না সন্দেহ। উপন্যাসকে মৃত বলে ঘোষণা করে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার চেষ্টা হয়েছে বহুবার কিন্তু তা সত্ত্বেও উপন্যাস তার আপন সজীবতায় এখনও জীবিত এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার অবিসংবাদী প্রাধান্য এখনও অক্ষুণ্ণ।

তবে কোন কোনো দেশে উপন্যাসের অবস্থা যে বেশ কাহিল তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। আটলান্টিক মহাসাগরের দুই তীরেই উপন্যাস নিয়ে হঠাৎ হঠাৎ আলোচনার ঝড় ওঠে। কখনও আলোচনা হয় প্রশ্নমালার আকারে, কখনও বা উপন্যাসিক, সমালোচক এবং বিদগ্ধ সাহিত্য রসিকদের বিশেষ বিশেষ সম্মেলনে, আবার কখনও বা পত্র-পত্রিকার পাতায় পাতায়।

এযুগে আমরা যখন পুরোনো সামাজিক কাঠামো ভেঙ্গে নতুন কাঠামো গড়ে তুলছি, তখন উপন্যাসের ভাগ্য নির্ভর করছে সাহিত্যের প্রবণতা ও তাৎপর্য বিষয়ক যুক্তির অন্তস্থলে।

প্রথমত অন্যান্য যে কোন প্রকার সাহিত্য প্রয়াসের চেয়ে উপন্যাসের ব্যাপ্তি বেশি। কাজেই ভাষায় প্রকাশযোগ্য আধুনিক বিশ্বের পরিপূর্ণ চিত্র উদ্‌ঘাটনের প্রশ্ন উঠলেই প্রথমেই উপন্যাসের কথা মনে আসে।

দ্বিতীয়ত সাহিত্য আঙ্গিকের মধ্যে উপন্যাসই সব চেয়ে গণতান্ত্রিক। জীবনের এক বিস্তৃত অংশকে উপন্যাস আমাদের সামনে হাজির করে এবং নীতি অর্থনীতি রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ক সমস্যার উপর আলোকপাত করে। এক কথায় বলা যায়, উপন্যাসের কোন নিষিদ্ধ এলাকা নেই। জীবনে যা ঘটছে, তারই "হুবহু প্রতিরূপ" উপন্যাসে পরিস্ফুট হয়। তার ক্রমাগ্রগতির মধ্য দিয়ে বাস্তব জীবনের পূর্ণ ও খুঁটিনাটি চিত্র প্রতিফলিত হয়। তা ছাড়া উপন্যাসের প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা কবি ও গল্প লেখকদের ঈর্ষার বস্তু। পরিশেষে উপন্যাস বাস্তব জীবনের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট।

প্রায় একশ বছর আগে রুশ সমালোচক বেলিনস্কি উপন্যাসের সহিত বাস্তবজীবনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। প্রকৃতই, উপন্যাসে বাস্তবতা অতি সজীবভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এঙ্গেস্ লিখেছিলেন, "বিশেষ বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ বিশেষ (Typical) চরিত্র সৃষ্টির প্রতি বিশ্বস্ততাই উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য।" ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, বাস্তবতার স্বর্ণ যুগে, উপন্যাসও স্বর্ণযুগে পৌঁছেছিল। উপন্যাসের মধ্যেই আমরা বাস্তবতার বিজয় গৌরব দেখতে

পাই। এযুগে ফরাসী সাহিত্যিক ফ্রাঁসোয়া মরিয়াক ন্যায়সঙ্গত ভাবেই স্বীকার করেছেন যে উপন্যাসিকের সঙ্গে বাস্তবজীবনের বিবাহানুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই উপন্যাসের চরিত্র জন্মলাভ করে এবং বাস্তববাদীর প্রধান কর্তব্য হচ্ছে বাস্তবতার প্রতি বিশ্বস্ত থাকা।

আধুনিক ক্ষয়িষ্ণুতার চমূরা যখন বাস্তবতার উপর আক্রমণ চালায় তখন তাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হয় বাস্তববাদী উপন্যাস। সাহিত্যের বাস্তবতা সংক্রান্ত বিতর্ক প্রায়শই উপন্যাস বিষয়ক বিতর্কে পরিণত হয়। সেই কারণেই সেই সমস্ত বিতর্ক অতিতিক্ত এবং অত্যন্ত মৌলিক হয়ে ওঠে।

উপন্যাস সম্পর্কে পশ্চিম ইউরোপ ও মার্কিন সাহিত্য সমালোচনা বহুধা বিস্তৃত। কেউ কেউ সমসাময়িক উপন্যাসের ধারা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে তর্ক করেন, কেউ বা তার লক্ষ্য, কর্তব্য এবং আঙ্গিক নিয়ে আলোচনা করেন। কিন্তু সমস্ত আলোচনার মধ্যেই থাকে এক উদ্বেগের সুর। তাদের মতামত ও ধ্যানধারণায় যতই পার্থক্য থাক সেই উদ্বেগের মধ্যে আধুনিক বুর্জোয়া উপন্যাস সম্পর্কে তাঁদের কোন না কোন রকমের অসন্তোষই প্রকাশ পায়। উপন্যাসের স্বর্ণযুগ বিগত হয়েছে বলে কখনও কখন করুণ সুরের হা হুতাশ শোনা যায়। এই মত পোষণ করেন মার্কিন সমালোচক আলফ্রেড কাজিন এবং পশ্চিম জার্মান পণ্ডিত ওলফগ্যাঙ্গ কেসার। শেষোক্ত ব্যক্তির লেখা "Crisis of Modern Novel" এ ব্যাপারে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ক্লাসিক সাহিত্যের উচ্চ প্রশংসা করে কেসার এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মত ঘটনার সম্মুখীন হয়ে বুর্জোয়া দেশের (সোভিয়েট সাহিত্যের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি মৌন) সমসাময়িক উপন্যাস একেবারে দেউলিয়া প্রতিপন্ন হয়েছে। তারা মহাকালের যুগান্তকারী ঘটনা প্রকাশে উপযুক্ত আঙ্গিক খুঁজে পায়নি। Stream of consciousness মার্কা উপন্যাস সম্পর্কে কেসার অতি নির্মম। তিনি বলেন, ওটা উপন্যাস আঙ্গিকের অপমৃত্যু। অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তিনি লিখেছেন, মানসিক রোগের চিকিৎসক আর ডাক্তার ছাড়া আর কে এই সমস্ত সম্বন্ধে আগ্রহশীল হতে পারে? এ সব বইয়ের অভিনবত্ব ঘুচে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের হাই উঠবে আর গা বমি বমি করবে।

কেসারের মতে সমসাময়িক উপন্যাসের পুনরুজ্জীবনের একমাত্র আশা ক্যামুর The pestilence। এই বিখ্যাত উপন্যাসের অনেক গুণ আছে সত্য কিন্তু মূল ভাব অত্যন্ত হতাশাব্যাঞ্জক। এর প্রধান চরিত্র Dr Rienx বলছেন," প্লেগ বীজাণুর মৃত্যু নেই। ঘরে ঘরে বছরের পর বছর ধরে এই বীজাণু ঘুমিয়ে থাকে। তারপর মানুষকে যাতনা আর পীড়া দেবার জন্য একদিন সে তার ইঁদুর নিয়ে আবার জেগে ওঠে এবং সুখী সহরে মৃত্যুর দূত পাঠিয়ে দেয়।" উপন্যাসটি এই দর্শন প্রচার করছে। এই উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু প্লেগ নয় যুদ্ধ কারণ প্লেগের অর্থ যুদ্ধ এবং বীজাণুবাহক ইঁদুর হচ্ছে ফ্যাসিষ্টরা। উপন্যাসের শেষ বক্তব্য—যুদ্ধ শাশ্বত কালের। যুদ্ধের হাত থেকে মুক্তি নেই। মানুষ শক্তি হীন……।

The Pestilence এমন একখানি উপন্যাস যেখানে বাস্তবতা নিছক একটা খোলস যার আড়ালে আসল জিনিসটি গোপন আছে। এর সঙ্গে হতাশাব্যাঞ্জক ভাবধারা খুব ভাল খাপ খায়।

ফল প্রকৃতিবাদ আর প্রতীকবাদের অদ্ভুত সংমিশ্রণ। তাই এই আঙ্গিক জার্মান সমালোচকের কাছে বড় ভাল লেগেছে। কারণ আসলে এই বইয়ে বিস্তৃত সামাজিক পটভূমিকা, সুগভীর শ্রেণী বৈশিষ্ট্য, এবং মানব মনস্তত্বের বাস্তব রূপায়ণের কৃতিত্ব ইত্যাদি জিনিসগুলোকে সচেতনভাবেই বাদ দেওয়া হয়েছে, কামুর সপ্রতিবন্ধমূলক জগৎ ও মানুষের মধ্যে শ্রেণীবিরোধ আর সামাজিক পাপের (প্লেগ যমদুতের মত মানুষের উপর মৃত্যু হানছে) অভাব উপন্যাসের গণতান্ত্রিকতা নষ্ট করছে। স্টেণ্ডালের ভাষায় “রাজপথের দর্পণ” হবার গুণও এ হারিয়েছে। এক কথায়, এর কোন সামাজিক চরিত্র নেই।

“বালজাক বিরোধী” [কি ভাবব্যঞ্জক নাম!] তথাকথিত রোমান নোভো [roman nouveaw] গোষ্ঠীর প্রতিনিধি এলেন রবি-গ্রিলেট, নাথালি, সারাউটে এবং মাইকেল বুটরের আধুনিক উপন্যাস সম্পর্কীয় ধারণা আরও অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এঁদের সম্বন্ধে ফরাসী সাহিত্য সমালোচক বার্নার্ড ভোর্ট লিখেছেন যে, এই ধরনের উপন্যাস “কোন ক্রমেই মানুষ আর পৃথিবীর সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।” এর উদ্দেশ্য হল “রাত্রির ভয়াবহ শূন্যতাকে রূপায়িত করা।” উপন্যাসের বিষয়বস্তু “মানুষ নয়, জড় পদার্থ। কারণ মানুষের মৃত্যু আছে, জড় পদার্থের মৃত্যু নেই।”

উপন্যাসগুলোর ভিতরে ঢুকলে বুঝতে দেরী হয় না যে সেগুলো সত্যিই বালজাক-বিরোধী অর্থাৎ ভীষণভাবে বাস্তবতা বিরোধী। বিশ্বের বিস্তারিত মহাকাব্যিক বাস্তব চিত্র উদ্ঘাটনের দায়িত্ব এতে সচেতন ভাবে ত্যাগ করা হয়েছে। সত্যি সত্যিই জড় পদার্থই এই সব উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। এর নাম দেওয়া হয়েছে choseism. ফরাসী chose (জড়পদার্থ) থেকে এসেছে শব্দটা। রবি গ্রিলোটের Jealousy থেকে এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে ঃ—

“ডান হাত এক টুকরো রুটি তুলে মুখে পোঁছে দিচ্ছে, ডান হাত রুটির টুকরোটা শাদা টেবল ক্লথের উপর রেখে একটা ছুরি তুলে নিচ্ছে, বাঁ হাতে তুলছে কাঁটা, মাংসের টুকরোর উপর কাঁটা ফোটানো হচ্ছে, ছুরি মাংসের একটা টুকরো কাটছে, ডান হাত ছুরিখানা টেবল ক্লথের উপর রাখছে, বাঁ হাত কাঁটাটাকে ডান হাতে তুলে দিচ্ছে, ডান হাত মাংসের টুকরোয় কাঁটা ফুটিয়ে মুখের কাছে আনছে মুখ হাঁ করে এবং হাঁ বন্ধ করে চিবুতে সুরু করছে, গাল, চোখ, কান সহ সমস্ত মুখটা নড়ছে ডান হাত আবার কাঁটা তুলে বাঁ হাতে দিচ্ছে, তারপর তুলে নিচ্ছে রুটি তারপর ছুরি তারপর কাঁটা।”

নাথালি সারাউটে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে অতি পরিষ্কারভাবে তাঁর সাহিত্য প্রত্যয় ব্যাখ্যা করে বলেছেন, “আমার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল চায়ের কাপে তুফান তোলা”।

প্রায় তিরিশ বছর আগে প্রতিভাবান ইংরাজ সমালোচক র‍্যালক ফক্স তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন যে সমসাময়িক উপন্যাসের নায়ক আর ঐতিহাসিক মানুষ নেই। আগেকার নায়করা ছিল সামাজিক সম্পর্কে সমৃদ্ধ এবং ইতিহাসের স্রষ্টা। আধুনিক বুর্জোয়া উপন্যাসে ঘটনার দুর্বোধ্য বিশৃঙ্খলার মুখে ক্রমবর্দ্ধমান বিভ্রান্তি ও আতঙ্কের সুর শোনা যায়।

ফ্রাঁসোয়া সাগাঁর উপন্যাসগুলোর সফলতা যুগের লক্ষণ প্রকাশ করে না। সাগাঁ তার উপন্যাস জীবনের দ্বারা বিপর্যস্ত এই পুরুষের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরবার আন্তরিক চেষ্টা করেছেন। সম্প্রতি আঁদ্রে স্টীল ‘হিউম্যানাইট’ পত্রিকায় লিখেছেন, “একটা ভিজে সিগারেট জ্বালাবার জন্য

বার্নার্ডের অক্লান্ত প্রচেষ্টা—ফ্রাঁসোয়া সাগাঁর এই চিত্রকল্পটি ইচ্ছাকৃত ভাবে অসার করে দেখালেও এটিই বোধ হয় তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে অনন্য চিত্রকল্প।"

এরিক মারিয়া রেমার্ক বলেছেন, বিরাট বিশ্ব এবং পারিপার্শ্বিক বিশৃঙ্খলা থেকে যে ক্ষুদ্র বিশ্ব মানুষকে রক্ষা করছে, আধুনিক ঔপন্যাসিকের কাছে তার মূল্যই সব চেয়ে বেশি।

ক্ষুদ্র বিশ্বের পথ (পলায়নের ?) অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তির মূল্যবোধের প্রভুত্বে বিপর্যস্ত কঠোর পৃথিবী থেকে ক্ষুদ্র বিশ্বে প্রবেশের ব্যর্থ চেষ্টা—এটা পাশ্চমী উপন্যাসের প্রধান ঝোঁক। অবশ্য সৎ এবং প্রতিভাবান পশ্চিমী ঔপন্যাসিকরা এই "ক্ষুদ্র বিশ্বে"ও অবলুপ্ত মানবতা অনুসন্ধানের চেষ্টা করছেন এবং এই "অনুবীক্ষণী বাস্তবতা" (microrealism) একেবারে নিষ্ফল নয়। কিন্তু এই "অনুবীক্ষণী বাস্তবতার" সীমাবদ্ধতা ক্রমেই বড় বেশি প্রকট হয়ে উঠছে এবং "বিশৃঙ্খল" সমসাময়িক বিশ্বে উপন্যাসের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে।

সমসাময়িক পশ্চিমী উপন্যাসে আরও কয়েকটি ঝোঁক দেখতে পাওয়া যায়। তার মধ্যে কোন কোন ঝোঁকের লক্ষণ ভাল। বাস্তবতার ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন ও নবীন ঔপন্যাসিকের সংখ্যা কিছু কম নয়। তাঁরা সামাজিক উপন্যাস লিখে থাকেন। কিন্তু এঁদের সঙ্গে আছেন, সেই সব লেখকরাও—যাঁরা আধুনিক সমাজের বৃহত্তর চিত্র রূপায়ণের নীতি বর্জন করেছেন।

কিছুকাল আগে মাদ্রিদের "লা এস্টাকেটা লিটাবারিয়া" পত্রিকা নভেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে এক গবেষণার আয়োজন করেন। স্পেনীয় লেখক লুই গয়টিসোলো গে অতি তীক্ষ্ণ ভাষায় স্পষ্ট করে বলেছিলেন, "যখন কোন সমাজ কাঠামো সঙ্কটের সম্মুখীন হয়, তখন সেই সমাজের অন্যতম অবদান উপন্যাসও যে সঙ্কটের সম্মুখীন হবে, তাতে আর সন্দেহ কি?" স্পেনীয় রয়েল একাডেমীর সদস্য ক্যামিলো জোসে সেলা বোধ হয় এই তত্ত্বকেই আরও জোরদার করে বলেছিলেন, "সমালোচনামূলক যে কোন প্রকাশভঙ্গির মত উপন্যাস হচ্ছে স্বাধীনতার অবদান। স্বাধীনতার আদর্শ কতখানি জীবন্ত সেই দিকে আগে দৃষ্টিপাত করা যাক। দৃষ্টিপাতের পরিণাম খুবই মর্মান্তিক হয়েছিল। উপরোক্ত পত্রিকায় এ সম্পর্কীয় প্রশ্নাবলী প্রকাশের পরই ফ্রাঙ্কোর পুলিস এক রাজনৈতিক অভিযোগে লুই গয়াটসোলো গে কে গ্রেপ্তার করে।

[সোভিয়েত লিটারেচার হইতে]

[পরবর্তী সংখ্যায় আধুনিক বাঙলা উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করা হবে]

মনরোগের কারণ নির্ণয়

(৩)

মনোবিদ

মনরোগের কারণ নির্ণয়ে ফ্রয়েড, এ্যাড্‌লার, ইয়ুং ও তাঁদের অনুবর্তী প্রবৃত্তিসর্বস্ব মনস্তাত্ত্বিকের দল যে কল্পনার সৌধ নির্মাণ করেছিলেন আজ নব আবিষ্কৃত তথ্যের আঘাতে সে সৌধ ভগ্নপ্রায়। 'মানব মনের' দুটি সংখ্যায় আমি পাঠকদের কাছে এই কথা বলতে চেয়েছি। নিউরোসিসের কারণ সম্পর্কে পাভলভীয় ধারণা নিয়ে আলোচনা করবার আগে বলা দরকার যে, নিউরোসিস তথা মনরোগের কারণ নির্ণয়ে সট্রাম্‌পেল, রেমণ্ড প্রভৃতি পণ্ডিতের দল মস্তিষ্ক কোশের অঙ্গ সংস্থান সংক্রান্ত অতিসূক্ষ্ম পরিবর্তনের [micro-morphological changes] আবিষ্কার-আশা পোষণ করতেন। ফ্রয়েডীয় পণ্ডিতদের একেবারে বিপরীত মতাবলম্বী এঁরা। প্রথমোক্ত দলকে যদি বলা যায় ভাববাদী দর্শনাক্রান্ত তবে দ্বিতীয়োক্ত দলকে ফেলা যায় যান্ত্রিক জড়বাদীদের দলে। ফির্কাও প্রবর্তিত কোশ-ভিত্তিক বিকারতত্ত্বের [cellular pathology] বাহক ও ধারক এই স্ট্রাম্‌পেল-রেমণ্ডের দল। কোশের বিকার বা আকস্মিক পরিবর্তন ছাড়া রোগ উপসর্গ দেখা দিতে পারে না—এই ছিল এঁদের ধারণা। পরবর্তীকালে আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের হাসপাতালের রেকর্ড থেকে নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হয়েছে যে সাধারণতঃ যত রোগী হাসপাতালের বহির্বিভাগে চিকিৎসার জন্য আসেন, তাঁদের অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশের রোগ উপসর্গের কোশভিত্তিক কোন কারণ নেই। যন্ত্রের বিকলতাজনিত উপসর্গ [Functional symptoms] আজ চিকিৎসকমহলে স্বীকৃত; যদিও এর বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা সুবিদিত নয়। দেহ-মন সমান্তরালবাদ [psycho-physical parallelism] সূত্র দিয়ে যন্ত্রের বিকলতাজনিত উপসর্গের ব্যাখ্যা চেষ্টা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত নয়। এবার নিউরোসিসের কারণ সম্বন্ধে পাভলভ ও তাঁর সহকর্মীদের গবেষণা প্রসঙ্গে আসা যাক।

জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে মানুষের উচ্চতর স্নায়ু-প্রক্রিয়া ও মানসিকতা গড়ে ওঠে। গুরুমস্তিষ্কের কোশগুলো খুবই নমনীয় ও সহজেই পরিবর্তন সাধ্য। সমাজ ও প্রকৃতির নানা পরিবর্তনের সঙ্গে একটা গতিশীল সামঞ্জস্য [dynamic equlibtrium] রেখে চলবার ক্ষমতা আছে মানুষের। পুরাণো অভ্যাস ভেঙ্গে নতুন অভ্যাস গড়ে জীবন পথে এগিয়ে চলে মানুষ। পাভলভ দেখিয়েছেন, এই ভাঙ্গা-গড়ার কাজে গুরুমস্তিষ্কের ভূমিকা প্রধান। পাভলভের মতে গুরুমস্তিষ্ক কোশের নমনীয়তা (প্ল্যাসটিসিটি) ও সম্ভাবনাময়তা অসীম; কাজেই শর্তাধীন রিফ্লেক্স তৈরীও হতে পারে অগুন্তি। যদি শর্তগুলি হাতের কাছে থাকে, তবে নতুন রিফ্লেক্স তৈরী সব সময়েই সম্ভব। কোনো অবস্থাতেই মানবপ্রকৃতি অনড় নয়, উৎকর্ষসাধনের সম্ভাবনায় উজ্জ্বল।

কিন্তু উচ্চমস্তিষ্কের সামনে এমন শর্তও আসতে পারে, যে শর্তানুযায়ী নতুন রিফ্লেক্স গড়া—সেই মস্তিষ্কের পক্ষে সম্ভব নয়। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের চাপ ক্রমশঃ বেড়ে উঠতে পারে; বেশী দিন ধরে

চললে যে-কোনো সুসম শক্তিশালী স্নায়ুতন্ত্রও এর চাপে ভেঙে পড়তে পারে। ফলে ঘটতে পারে উচ্চ মস্তিষ্কের বিকলতাজনিত অসুস্থতার সৃষ্টি। আর দীর্ঘদিন স্থায়ী উচ্চমস্তিষ্কের বিকলতাজনিত অসুস্থতাই পাভলভের সংজ্ঞানুযায়ী নিউরোসিস। নিউরোসিসের রীতি প্রকৃতি ও উপসর্গের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে নিউরোটিকের মস্তিষ্কের প্রকৃতি ও বৃত্তির বৈশিষ্ট্যের উপর।

ল্যাবরেটরী ও ক্লিনিক থেকে সংগৃহীত তথ্য (পাভলভকে ধন্যবাদ!) আজ মনরোগের কারণ নির্ণয়ে বিশেষ আলোকপাত করেছে। এখন আমরা জানি যদি কোনো, স্নায়ুতন্ত্রের সহন ক্ষমতার থেকে বেশী জোরালো শর্তহীন বা শর্তাধীন রিফ্লেক্স গুরুমস্তিষ্ককে প্রভাবিত করে, তবে মস্তিষ্কের মৌলিক ধর্মের [উত্তেজনা-নিস্তেজনা] তীব্রতা ও পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে কর্টেক্স ও সাবকর্টেক্স অর্থাৎ গুরুমস্তিষ্ক ও নিম্নমস্তিষ্কের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় ও মানুষের বেলায় প্রথম ও দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরে ঘটে বিশৃঙ্খলা। উত্তেজক বা নিস্তেজক উদ্দীপকের অতিতীব্রতা অথবা এদের গতিশীলতার দরুন সংঘাত থেকে নিউরোসিসের উৎপত্তি।

মানসিক উদ্দীপকের তীব্রতা ও আকস্মিকতা যেমন বিশৃঙ্খলা ঘটাতে পারে, তেমনি পারে উদ্দীপকের দীর্ঘস্থায়িতা। অবশ্য মানসিক রোগ দেখা দেবে কি না, নির্ভর করে ব্যক্তির নার্ভতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যের ও ব্যক্তির পক্ষে ঐ উদ্দীপকের গুরুত্বের উপর। এ-ছাড়া উদ্দীপনা মুহূর্তে ব্যক্তির মানসিক অবস্থার কথাও মনে রাখা দরকার। প্রক্ষোভ-পীড়িত মনে লঘু উদ্দীপকেরও গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। বহির্বাস্তব ও আন্তরযন্ত্রের মধ্যে গতিশীল সামঞ্জস্য কোনো ঘটনায় যদি ভেঙ্গে পড়ে, বা নতুন করে যদি সামঞ্জস্য বিন্যাসের চেষ্টা করতে হয়, তবে উচ্চ মস্তিষ্কের রীতি প্রকৃতিতে নিদারুণ বিশৃঙ্খলা ঘটে; নিম্নমস্তিষ্কের প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে উচ্চমস্তিষ্ক। দেখা দেয়—উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, ভয়, আত্মবিশ্বাসের অভাব, দুর্বলতা বোধ, অপরিসীম ক্লান্তি ও সমাধানাতীত মানসিক দ্বন্দ্ব : নিউরোসিসের নানা উপসর্গ। মস্তিষ্কের স্থিতিস্থাপকতার আরও অবনতি ঘটতে থাকে। সহজ কাজ কঠিন মনে হয়, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা বিড়ম্বনা হয়ে ওঠে। স্থিতিস্থাপকতার অবনতির ফলে ব্যক্তির অভিভাব্যতা, বিশেষ করে স্ব-অভিভাব্যতা [auto-suggestibility] বৃদ্ধি পায়। পরবর্ত্তীকালে এই স্ব-অভিভাব্যতা রোগ-উপসর্গকে জটিলতর করে তোলে এবং রোগকে জীইয়ে রাখে। মনরোগের বিভিন্ন কারণগুলোকে পৃথক পৃথক ভাবে বিশ্লেষণ করার আগে পাভলভীয়দের নিউরোসিসের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন।

প্রাক্-পাভলভ যুগে মনোরোগ তথা নিউরোসিসের শ্রেণীবিভাগের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল না। পাভলভ প্রথম দেখালেন যে, নিউরোসিসের শ্রেণী মস্তিষ্কের টাইপের উপর নির্ভর করে। ১৯২৪ সালে লেনিনগ্রাডের বন্যার পর প্রথম প্রাণীর মধ্যে নার্ভতন্ত্রের বা মস্তিষ্কের বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করেন পাভলভ। সমুদ্রের ঢেউ পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে এসে আছড়ে পড়ছে ল্যাবরেটরির গায়। ঝড়-বিদ্যুতের মাতামাতি দাপাদাপি বাইরে। নীচুর তলায় পাভলভের কুকুরগুলোর আস্তানা, সেখানে জল ঢুকছে অবিরাম। বাজের শব্দ, ঝড়ের শব্দ কানে তালা ধরিয়ে দিচ্ছে। আশেপাশে গাছপালা ভেঙ্গে পড়ছে—সেই শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিপন্ন মানুষের আর্তচীৎকার। এমনি অবস্থায় কুকুরগুলোকে চারতলার একটা ঘরে নিয়ে আসা হয়। আশ্চর্য—

পাভলভ লক্ষ্য করলেন—তারা পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া সুরু করে দিল না। কারণ কি? দারুণ দুর্যোগ ও বিপত্তির মুখে—এই রকম বন্যার সময়—ভাসমান কোনো আশ্রয়ে বিষধর কেউটে আর মানুষ বন্ধুর মত একসঙ্গে থাকতে পারে—এ সংবাদ আমরা জানি। আকস্মিক দুর্যোগ আত্মরক্ষা প্রবৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করে প্রাণীর মস্তিষ্ক পুরোপুরি নিস্তেজিত করে দিয়েছে,—পাভলভ বুঝতে পারলেন। বেশী শক্তিশালী শর্তহীন রিফ্লেক্স কম শক্তিশালী রিফ্লেক্সকে অকেজো করে দিতে পারে পাভলভ জানতেন। সে কথা এখন থাক। কুকুরগুলোকে এই 'নিদারুণ অভিজ্ঞতার পর' নিজের নিজের জায়গায় ফিরিয়ে আনা হল। কিছু সংখ্যক কুকুর আগের মতই ব্যবহার করতে লাগল, কিন্তু কয়েকটি কুকুরের আচরণে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। পাভলভ প্রাকৃতিক দুর্যোগ-জনিত নিউরোসিসের প্রকাশ দেখলেন। পাভলভ বুঝলেন—বহিবাস্তবের অতি শক্তিশালী উদ্দীপক [এ-ক্ষেত্রে বন্যা] নার্ভতন্ত্রকে রোগাক্রান্ত করতে পারে যার ফলে ঘটে উচ্চ মস্তিষ্ক ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা। আরও জানলেন যে, একই প্রজাতির সকল প্রাণীর নার্ভতন্ত্রের সহনশীলতা একরকমের নয়। শক্তিশালী উত্তেজক-উদ্দীপকের সংঘাত দুর্বল মস্তিষ্ককে রোগাক্রান্ত করতে পারে। আর দেখলেন বিভিন্ন ধরনের নার্ভতন্ত্রে রোগের প্রকাশ পায় বিভিন্নরূপে।

নার্ভতন্ত্রের ধরনটা কি? কোন কোন ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য দিয়ে বিভিন্ন ধরন সূচিত করা হয়? এ বৈশিষ্ট্য কি জন্মদত্ত না পরিবেশায়ত্ত?

নার্ভতন্ত্রের 'টাইপ' বা বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে মৌলিক নার্ভপ্রক্রিয়ার [উত্তেজনা ও নিস্তেজনা] মাত্রা ভারসাম্য ও গতিময়তার [strength, balance & mobility] বিচার করা হয়। মাত্রা ও ভারসাম্য কথা দুটির ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। গতিময়তা উত্তেজনা থেকে নিস্তেজনা অথবা নিস্তেজনা থেকে উত্তেজনায় রূপান্তরণের মাপকাঠি। সেই নার্ভতন্ত্রকে বেশী গতিময় (mobile) বলি যেখানে এই রূপান্তরণ ক্রিয়া অতি সহজে ও দ্রুত সম্পন্ন হয়। গতিময়তা যাদের বেশী তারাই সহজে পুরনো শর্তাধীন রিফ্লেক্স ভেঙ্গে নতুন পরিবেশ অনুযায়ী নতুন শর্তাধীন রিফ্লেক্স তৈরী করতে সক্ষম। মানিয়ে নেবার ক্ষমতা তাদের বেশী।

মোটামুটি চার রকমের টাইপ দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য বাস্তবক্ষেত্রে সকলকে এই চার টাইপের দেওয়ালের মধ্যে বাঁধা যায় না। চব্বিশের ও বেশী সাব্ টাইপ আবিষ্কার করা গেছে এযাবত। আমাদের আলোচনা চারটি টাইপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

উত্তেজনা ও নিস্তেজনার তীব্রতার তারতম্য অনুযায়ী নার্ভতন্ত্রকে প্রথমে 'সবল ও দুর্বল' দুভাগে ভাগ করা হয়। দুর্বল টাইপের বিশেষত্ব এই যে তাদের মস্তিষ্কে উত্তেজনা ও নিস্তেজনা দুয়েরই তীব্রতার অভাব; স্নায়ুপ্রক্রিয়ার মাত্রানধিক্য। তা ছাড়া এদের সহ্যক্ষমতাও কম। উত্তেজনা বা নিস্তেজনার মাত্রা একটু বাড়লেই এরা আর তা সইতে পারে না। উচ্চমস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের বিশৃঙ্খলা এদের মধ্যে অতি সহজেই প্রকাশ পায়। নিউরোসিসের প্রধান উৎস হল দুর্বল টাইপের মস্তিষ্ক। বিষাদ রোগের প্রাদুর্ভাব এদের মধ্যে বেশী বলে এদের বলা হয়েছে melancholic বা বিষন্ন টাইপ। এরা অল্পেতেই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে; আত্মবিশ্বাস এদের থাকে না ও এরা সব কাজ উৎসাহের অভাব বোধ করে। এরা

সব তাতেই ভয় পায় ও সব সময়েই অতি মাত্রায় উৎকণ্ঠিত থাকে। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে এদের বিশেষ কষ্ট হয়, দুঃখকষ্টের মুখে বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে পড়ে ও পরিবর্তন ও নতুনত্বকে সন্দেহের চোখে দেখে। আমাদের দেশে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মস্তিষ্কের বেশী সংখ্যাই এই টাইপের অন্তর্গত।

সবল মস্তিষ্কের তিনটি প্রধান টাইপ নির্দেশ করেছেন পাভলভ। এদের দুটি টাইপের মধ্যে আছে উত্তেজনা নিস্তেজনার সমতা আর একটি টাইপের মধ্যে এই সমতার অভাব। অসমঞ্জস এই টাইপের বিশেষত্ব এদের অতি-উত্তেজনা প্রবণতা। নিস্তেজনা ক্রিয়া এদের দুর্বল। পাভলভের ভাষায় এরা "Unrestrained" বা অসংযত টাইপ। মনরোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা এদেরও যথেষ্ট। এরা সাধারণত অতি মাত্রায় উৎসাহী ও আত্মবিশ্বাসী। প্রাণশক্তি ও কর্মশক্তির প্রাচুর্যে সদা চঞ্চল। দৃঢ়চেতা ও সদাসর্বদা নতুনত্বের সন্ধানী। কিন্তু এরা অসহিষ্ণু, অসংযমী। আত্মশক্তি সম্বন্ধে ওদের ধারণার অতিশয়তা ও এদের সীমাহীন উচ্চাকাঙ্খা এদের জীবনে প্রায়শই অসাফল্য নিয়ে আসে, যদিও এদের মধ্যেই পাই আলেকজাণ্ডার, ড্রেক ও কলম্বাসের সন্ধান।

সুসমঞ্জস নার্ভতন্ত্রের অধিকারী দুটি টাইপের মধ্যে পার্থক্য আছে গতিময়তার। যে-টাইপের গতিময়তা কম, যাদের উত্তেজনা-নিস্তেজনার রূপান্তরণ অপেক্ষাকৃত শক্ত ও সময়সাপেক্ষ, তাদের বলা হয় ফ্লেগম্যাটিক (phlegmatic) টাইপ। অপরপক্ষে অন্য টাইপের গতিময়তা বেশী। উত্তেজনা-নিস্তেজনা রূপান্তরণ সহজেই ঘটে। পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে খুব সহজেই এরা নিজেদের মানাতে পারে। উত্তেজনা-নিস্তেজনার সমতা থাকায় এই দুই টাইপেই মনরোগের প্রাদুর্ভাব বিরল। অবশ্য মনে রাখা দরকার অতি-দুঃসহ পরিবেশ বা অতি-কঠিন জীবন সংগ্রামে এদেরও স্নায়ুপ্রক্রিয়ায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে ; এরাও ভেঙ্গে-পড়তে পারে। দ্বিতীয়টি 'স্যান্‌গুইন' (sanguine) টাইপ বলে অভিহিত।

ফ্লেগ্‌ম্যাটিকের বিশেষত্ব, তারা সংযমী, অধ্যবসায়ী, অচঞ্চল, ধীর, স্থির ও ঘাতসহ। এরা বিফলতায় ভেঙ্গে পড়ে না। উদ্যমশীলতার অভাব এদের মধ্যে দেখা যায় না। দীর্ঘকাল ধরে একই বিষয় এরা কাজ করে যেতে পারে। উদ্দীপকের দীর্ঘস্থায়ীত্ব এদের বিকল করে না। তবে এরা চটপটে নয়, ধীরে সুস্থে কাজ করে ও এক কাজ থেকে অন্য কাজে যাওয়া এদের পক্ষে কষ্টসাধ্য। দীর্ঘস্থায়ী গবেষণামূলক কাজে এদের সাফল্যের সম্ভাবনা অধিক। বাহ্যত মনে হয় এরা যেন অনঢ় প্রকৃতির। কোনো সাড়া দিতে এদের সময় লাগে। অল্পেতেই উৎসাহ জাগে না।

সবল সুসম টাইপের অপরটি। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করতে পারে অবলীলাক্রমে, কেননা গতিময়তা তাদের বেশী। এরা সাড়া দেয় অল্পেতেই। আর সাড়া দেয় উৎসাহের সঙ্গে। বাহ্যতঃ "অতি উত্তেজনাপ্রবণ" টাইপের সঙ্গে এদের অনেক সাদৃশ্য। কিন্তু মনে রাখা দরকার এরা সংযমী। উত্তেজিত বা নিস্তেজিত সহজেই এরা হয় বটে, কিন্তু আত্মসংযমের ক্ষমতা এদের যথেষ্ট। বড় ব্যবসায়ের কর্মকর্তা, পার্টিনেতা ও রাষ্ট্রনেতাদের এই ধরণের নার্ভতন্ত্র বাঞ্ছনীয়।

পশু ও মানুষ দুয়ের মধ্যেই এই চার টাইপের সন্ধান মিলবে। কিন্তু মানবমস্তিষ্কের বিশেষত্ব তার দ্বিতীয় সাংকেতিক নার্ভতন্ত্র বা বাক্‌তন্ত্র। (Second Signalling System)। এই বিশেষত্বের

পরিপ্রেক্ষিতে পাভলভ মানুষের মধ্যে আরও তিনটি বিশিষ্ট টাইপের সন্ধান পেয়েছেন। পঞ্চেন্দ্রিয়-কেন্দ্রিক প্রথম সাংকেতিক নার্ভতন্ত্র (first signalling system) ও দ্বিতীয় সাংকেতিকতন্ত্রের সুসম বিন্যাস দেখা যায় "মধ্যবর্তী" বা intermediate টাইপে। এদের সংখ্যাই বেশী। 'আর্টিস্ট' টাইপ বলেছেন তাদের, যাদের প্রথম সাংকেতিকতন্ত্র অপেক্ষাকৃত বেশী শক্তিশালী দ্বিতীয়টির চেয়ে। আর 'দার্শনিক' টাইপ তারা, যাদের দ্বিতীয় সাংকেতিকতন্ত্র প্রথমটির থেকে বেশী জোরালো।

আর্টিস্ট বলতে কি বুঝেছেন পাভলভ ? প্রথম সাংকেতিকতন্ত্র পঞ্চেন্দ্রিয়ের গন্ধস্পর্শ-রূপ-রস ইত্যাদির অনুভূতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বহির্বাস্তব আর্টিস্টদের কাছে মূর্ত কল্পনায় প্রতিভাত, ভাবাবেগ রঙিন ও জীবন্ত। আর 'দার্শনিক' ব্যস্ত থাকেন তত্ত্ব নিয়ে, বিমূর্ত চিন্তা আর ধ্যানধারণার মাধ্যমে কারবার করেন জগতের সঙ্গে। কতকগুলো বিমূর্ত গাণিতিক সংকেতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে কল্পনা করে নিতে এঁদের আটকায় না। এদের ধ্যানধারণায় থাকে না রঙিন ভাবোচ্ছ্বাস বা বাস্তবের প্রত্যক্ষ মূর্ত রূপ। ভাষার যা কাজ "সামান্যীকরণ ও বিমূর্তকরণ" (Generalisation & abstraction)—এঁদের ভাষা-ভিত্তিক চিন্তার সাহায্যে তাই করে থাকেন। প্রথমোক্ত টাইপের তুলির আঁচড়ে রূপায়িত হয় রমণীর রূপ, সমুদ্রের নীল, বনের সবুজ এবং অনেক কিছু ; জীবনের খুব পরিচিত ঘনিষ্ঠ অনুভূতি জাগায় যে-সব উদ্দীপনা—বিশেষ ও ব্যক্তিগত আবেদন থাকে এইসব অনুভূতিতে। আর দ্বিতীয় সাংকেতিকতন্ত্রের আবেদন ব্যক্তি বিশেষকে ছাড়িয়ে, অনুভূতি ও আবেগকে এড়িয়ে মননশীল মগজের কাছে। তথ্য থেকে তত্ত্বে উত্তরণ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের কাজ।

যদি প্রথম অথবা দ্বিতীয় সাংকেতিক তন্ত্রের যে কোনটি বেশী মাত্রায় সক্রিয় হয় কোন মস্তিষ্কে, তবে ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। অতিমাত্রায় আর্টিস্ট বা অতিমাত্রায় দার্শনিক টাইপের সৃষ্টি হয়।

'টাইপ' সম্পর্কে এত কথা বলতে হচ্ছে, কারণ নিউরোসিসের কারণ নির্ণয়ে ও শ্রেণীবিভাগে এই 'টাইপ'এর জ্ঞান অপরিহার্য। 'টাইপ'এর বৈশিষ্ট্যগুলি সবই জন্মসূত্রে প্রাপ্ত ভাবলে কিন্তু ভুল হবে। মিচুরিন পাভলভ প্রমুখ বিজ্ঞানীরা কখনও "eternal & immutable heredity" অর্থাৎ কুলসংক্রমিত গুণাবলী শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয়—এ বিশ্বাস পোষণ করতেন না। বহির্বাস্তবের প্রভাব ও জীবনধারণের সুযোগসুবিধার তারতম্য থেকে প্রধানতঃ 'টাইপ'এর বিশেষত্বগুলো গড়ে ওঠে। পাভলভের মতে 'a reshaping and change of the inborn type is quite possible under the influence of these factors" অর্থাৎ জন্মসূত্রগত টাইপ পরিবেশের চাপে পরিবর্তিত হয়। কয়েক পুরুষ ধরে একই পরিবেশে গঠিত শর্তাধীন রিফ্লেক্স কুলসংক্রমক শর্তহীন রিফ্লেক্সে পরিণত হতে পারে। পাভলভের টাইপ মেণ্ডেল মরগ্যানের সূত্রাধীন নয়। নার্ভতন্ত্রের টাইপ-অনুযায়ী নিউরোসিসের শ্রেণীবিভাগ নিঃসন্দেহে মানসিক-রোগ-বিজ্ঞানের অগ্রগতির সূচনা। এই প্রথম বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে মনরোগকে বুঝবার প্রয়াস—একথা বললে অত্যুক্তি করা হবে না। একমাত্র মস্তিষ্ক কোশের উত্তেজনা, নিস্তেজনা ও গতিময়তাকে ভিত্তি করে শ্রেণীবিভাগের মধ্য দিয়েই 'নিউরোসিস'-এর গতিপ্রকৃতি ও মস্তিষ্ককোশের বিকলতার সন্ধান মিলতে পারে।

মোটামুটি নিউরোসিসকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। নিউর্যাসথেনিয়া, বা মধ্যবর্তী

টাইপের নিউরোসিস, হিষ্টিরিয়া বা আর্টিস্ট টাইপের নিউরোসিস এবং সাইক্যাসথেনিয়া বা দার্শনিক টাইপের নিউরোসিস।

বিভিন্ন শ্রেণীর নিউরোসিসের বিশদ বিবরণ দেবার আগে সাধারণভাবে নিউরোসিসের সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলা যাক।

আগেই বলেছি, পরিবেশের চাপ অনেক সময়েই ব্যক্তির নার্ভতন্ত্রের শক্তি ও সহনশীলতাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে, উত্তেজনা-নিস্তেজনা প্রক্রিয়া ও তাদের গতিময়তা এমনভাবে অতি-পীড়িত হতে পারে যে উচ্চমস্তিষ্ক ক্রিয়া বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। এই বিশৃঙ্খলাই নিউরোসিস।

উত্তেজনা-ক্রিয়ার অতিপীড়ন ঘটে সাধারণতঃ যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, খারাপ অবস্থার মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী পরিশ্রম ইত্যাদি থেকে। অনেকদিন ধরে বিপদের মধ্যে বা ভয়ে ভয়ে থাকলেও উত্তেজনাক্রিয়ার অতিপীড়ন ঘটে। আমরা যখন অবস্থার বিপাকে, নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে কোনো জোরালো ইচ্ছা বা কর্মপ্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রণ বা দমন করতে বাধ্য হই, তখন নিস্তেজনা-প্রক্রিয়ার অতি-পীড়ন (over-strain) ঘটে। চাকরি যাবার ভয়ে বড়সাহেবের অন্যায় অত্যাচারের অবিচারের প্রতিবাদ না করা, নীরস কর্তব্যের খাতিরে প্রেমহীন দাম্পত্যজীবন যাপন করা। অনিচ্ছার সঙ্গে নিরানন্দ কাজ করা ইত্যাদি নিস্তেজনা ক্রিয়ার অতিপীড়ন ঘটাতে পারে। অনবরত এবং ঘনঘন যাদের বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে মনঃসংযোগ করতে হয়, পরস্পর-বিরোধী আদর্শ নিয়ে যাদের কাজ করতে হয় অথবা যাদের কাজকর্ম বা চিন্তাধারার মধ্যে স্ব-বিরোধিতা বর্তমান, তাদের মধ্যে দেখা যায় গতিময়তার অতি-পীড়ন (overstrain of mobility), যাদের নার্ভতন্ত্র অলস ধরনের [inert] তারা যদি বারবার অভ্যস্ত জীবন-ধারণের রীতি বা পথ বদলাতে বাধ্য হয়—গতিময়তার অতি-পীড়নের ফলে তাদের উচ্চ-মস্তিষ্কক্রিয়ায় বিশৃঙ্খলা ঘটা খুবই স্বাভাবিক।

একথা কোনো সময়েই যেন মনে করা না হয় যে, নার্ভতন্ত্র সহশক্তির সীমা পূর্ব নিরূপিত বা দক্ষতা পূর্বনির্ধারিত। মনে রাখা দরকার, সহক্ষমতা বা দক্ষতা অপরিবর্তনীয়, স্থাণু [static] কিছু নয়। এর মাত্রাবৃদ্ধি সম্ভব। যেমন অতি পরিশ্রম, পুষ্টিকর খাদ্যাভাব, দৈহিক রোগ, মানসিক আঘাত, নিরাপত্তার অভাব ইত্যাদি নার্ভতন্ত্রকে দুর্বল করে দিতে পারে, তেমনি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, সুশিক্ষা ও সহনশীলতার অভ্যাস নার্ভতন্ত্রকে শক্তিশালী করে তুলতে পারে। ব্যক্তির দক্ষতা ও সহক্ষমতা বৃদ্ধির পক্ষে সব থেকে বেশী সহায়ক সমষ্টির সঙ্গে একাত্মবোধ ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাপত্তার আশ্বাস। যত বেশী সামাজিক হবে ব্যক্তি, ততই তার নিউরোসিসের সম্ভাবনা কম। যে সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তির আশা আকাঙ্ক্ষা অবহেলিত, ব্যক্তিসম্মান পদদলিত, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত—সেখানে নিউরোটিকের সংখ্যা বেশী। যেখানে মানবতাবোধ বেশী জাগ্রত, পারস্পরিক সহানুভূতি সহৃদয়তা পরিস্ফুট ও বিষম প্রতিযোগিতা দূরীভূত, সেখানে নিউরোটিকের সংখ্যা কম। যে মানুষ ভালবাসতে জানে, বন্ধুতার মর্য্যাদা রাখতে জানে, যে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ, কল্যাণকর মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত—নিউরোসিসের ছোঁয়াচ লাগার সম্ভাবনা তার খুবই কম।

নার্ভতন্ত্রের টাইপ সমস্যাটিকে পাভলভ অতি-গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে উপদেশ দিয়েছেন। কোনো ব্যক্তির নার্ভতন্ত্রের শক্তি বা পরিমাপের থেকে অনেক বেশী দামী তার ব্যক্তিত্বের সামাজিক মূল্য। উচ্চমস্তিষ্ক কোশের দুর্বলতাকে বা নার্ভতন্ত্রের গতিময়তার স্বল্পতা অথবা ভারসাম্যের অভাবকে জীবনের পক্ষে একটা নিদারুণ অসুবিধা ভাবলে ভুল করা হবে। আগেই বলেছি চারিত্রিক দৃঢ়তা, অনমনীয় ইচ্ছাশক্তি, শত্রুকে বা বিপদকে তুচ্ছ করা, কষ্ট সহিষ্ণুতা, শ্রেণী আনুগত্য ইত্যাদি সামাজিক গুণাবলি অভ্যাস-লভ্য ও বাক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক এবং নার্ভতন্ত্রের দুর্বলতার পরিপূরক। সমাজ ও ব্যক্তি সম্পর্কের সঠিক বিশ্লেষণ, জীবনের প্রধান সমস্যাগুলির সম্যক্ সমাধান, জটিল পরিস্থিতিতে ঠিকমত পথ নির্ণয়—জীবন-সংগ্রামের অপরিহার্য্য অঙ্গ ও এর মূল্য নার্ভতন্ত্রের সহ্যক্ষমতা ও গতিময়তার থেকে আদৌ কম নয়। নার্ভতন্ত্রের জন্মগত ক্ষমতার থেকে সামাজিক অভিজ্ঞতা-অর্জিত জ্ঞান ও চারিত্রিক বল মানুষের পক্ষে অনেক বেশী দামী।

* মানসিক ক্রমবিকাশ

দ্বিজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়
(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

জন্ম মুহূর্তে মানবশিশু এত অসহায়, এত পরনির্ভরশীল ও মানসিক ব্যাপারে এত নিষ্ক্রিয় যে অনেক ইতরপ্রাণীর মধ্যেও অতটা দেখা যায় না। মানবশিশু সহজ প্রবৃত্তির তাড়নায় হাত পা নাড়ে এবং কেবলমাত্র হাসি ও কান্নায় নিজের মনোভাব ব্যক্ত করে। প্রায় এক বছর বয়সের মধ্যে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এই সময় শিশুর দন্তোদ্‌গম্ হতে থাকে; হাঁটি হাঁটি পা-পা করে অল্প অল্প হাঁটে—আধো আধো কথা বলে। যা শোনে বা দেখে তাই নকল করবার চেষ্টা করে। এই নকল করবার প্রবৃত্তি তার মধ্য থেকে যায় এবং ভবিষ্যতে নানা বিষয়ের জ্ঞান লাভে সহায়তা করে।

মানুষের ক্রমোন্নতি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়ে ঘটে থাকে; অবস্থাগুলি যথাক্রমে শৈশব—জন্ম থেকে সাধারণত ধরা হয়, ৫ বৎসর পর্যন্ত; বাল্য—সাধারণত ৫ থেকে ১০ বৎসর পর্যন্ত, কৈশোর—১০ থেকে ১৬, যৌবন—১৭ থেকে ৪০, প্রৌঢ়ত্ব—৪০ ধেকে ৫৫ এবং তারপর বার্ধক্য। কোন দুটি অবস্থার মধ্যে একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা দিয়ে তাদের ভাগ করা যায় না। আগেকার অবস্থা পরবর্তী অবস্থার উপর অনেকখানি ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। এই দুই অবস্থার ব্যাপ্ত কালকে সন্ধিকাল বলে--ইংরাজীতে transitional period। ঋতুর দিক দিয়েও দেখতে গেলে আমরা এই রকম সন্ধিকালের সম্মুখীন হই। যথা শীতের পর বসন্ত। কোন্ নির্দিষ্ট দিনে শীত ঋতু বদলে গিয়ে বসন্ত ঋতু হলো যেমন বলা যায় না, ঠিক তেমনই কোন্ বিশেষ দিনে একটি ছেলে শৈশব ছেড়ে বাল্যে পা দিল বলা সম্ভব না। ঋতুর সন্ধিকালে আমরা যেমন শরীরের বিষয়ে খুব সতর্ক হই, পাছে ঠাণ্ডা লাগে এবং সর্দিতে কষ্ট পাই, ঠিক তেমনই বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের প্রতি পিতামাতার, শিক্ষক-শিক্ষয়ত্রীর অতিরিক্ত সচেতন হওয়া উচিত।

সংস্কৃতে একটি প্রবচন আছে—'লালয়েত পঞ্চবর্ষাণি, দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ, প্রাপ্তেষু ষোড়শ বর্ষে পুত্রমিত্রবদাচরেৎ' অর্থাৎ পাঁচ বৎসর পর্যন্ত লালন করবে, দশ বৎসর পর্যন্ত তাড়না

---

*শ্রদ্ধেয় লেখক এই মনোজ্ঞ নিবন্ধে অতিপ্রচলিতও সুপরিচিত ফ্রয়েডীয় মতবাদের উল্লেখ করেছেন। আজ ফ্রয়েডীয় মতবাদের পাশাপাশি স্বল্প পরিজ্ঞাত হলেও পাভলভীয় মতবাদের প্রসারকে অগ্রাহ্য করা যায় না। পাভলভীয় মনোবিজ্ঞান মস্তিষ্ক-বিজ্ঞানাশ্রিত ও বিষয়-নির্ভর পরীক্ষা নিরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত। 'মানসিক ক্রমবিকাশ' সম্পর্কে পাভলভীয় ধারণা ও অন্যান্য পণ্ডিতদের মতামত ক্রমশঃ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হবে।—সম্পাদক

করবে এবং সন্তান ১৬ বৎসরে পদার্পণ করলে তার সঙ্গে বন্ধুর মত আচরণ করবে। পাঁচ বৎসর পর্যন্ত লালন করবে এই কথার তাৎপর্য এই যে, পাঁচ বছরের শিশুর শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে স্নেহ ভালবাসার মধ্য দিয়ে পরিচালিত করতে হবে। উগ্রতা বা কঠোরতা যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে। এই সময়ে শিশুর মন অত্যন্ত কোমল ও স্পর্শকাতর থাকে, নিজের সুখ বিষয়েও তার মধ্যে বিশেষ সচেতনতা দেখা যায়। বাইরের জগৎ সম্পর্কে তার ধারণা অনেকটা কল্পনাকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে। সে ঠাকুমা-দিদিমার কাছ থেকে নানা উপকথা শোনে এবং তারফলে উচ্চাকাঙ্ক্ষা অঙ্কুরিত হয়। দাপটে বা রুক্ষ ব্যবহারে সদ্য-উন্মেষপ্রাপ্ত শিশুর মনের উপর একটা অবাঞ্ছিত রেখাপাত করতে পারে। দশ বৎসর পর্যন্ত তাড়না করবে—অর্থাৎ উচিত শিক্ষার জন্য কঠোর ব্যবহারের নিষেধ নেই। খেলাধূলা করা বালকবালিকার একটা সহজ প্রবৃত্তি। এই খেলাধূলা সুনিয়ন্ত্রিত হলে বালকবালিকার মনোবিকাশ সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। আগেই বলা হয়েছে, এরা অনুকরণ প্রবণ; সমাজবিরোধী কোনো আচরণ দেখে খেলায় তা অনুকরণ করলে ভবিষ্যৎ জীবন বিপথগামী হয়ে থাকে। অথচ এই অনুকরণবৃত্তিকে সুপথে চালিত করলে যে তার ফল শুভ হবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কাজেই এই অবস্থায় বালকবালিকার সুশিক্ষার জন্য প্রয়োজন হলে, তাদের প্রতি কঠোর ব্যবহারও করা যেতে পারে। এই কঠোরতার আরেকটি মূল্য আছে। এই সময়কালীন কঠোরতার সঙ্গে পরিচয়, ওদের ভবিষ্যতের কঠোর জীবন-সংগ্রামের উপযুক্ত করে তোলে। যে ছেলে কোনো রকম কঠোরতার আস্বাদ পায় নি, তাকে ভবিষ্যতে জীবন-সংগ্রামের ও শৃঙ্খলার কঠোরতা অতিমাত্রায় পীড়া দেয়। হয়ত অনেকক্ষেত্রে এই ভীতিজনক কঠোরতার জন্যে জীবনে সাফল্য লাভ তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। এই সময়ে বালকবালিকাকে এমন সব খেলায় নিয়োজিত করা উচিত, যাতে তার স্বার্থপরতা সামাজিকতায় রূপান্তরিত হয়, সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করবার খানিকটা ধারণা জন্মায় এবং তার মনে সুস্থ প্রতিযোগিতার একটা ইচ্ছা প্রকাশ পায়।

আমাদের ধারণা ৯।১০ বৎসর পর্যন্ত বালকবালিকাদের যৌনবোধ নেই। কিন্তু প্রফেসার সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড দেখিয়েছেন এই যৌনবোধ সহজাত। জন্মগ্রহণ করার পর থেকেই তার মধ্যে যৌনবোধ বর্তমান। তবে ছ-মাস বয়সের আগে এই যৌনবোধের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করা যায় না। ভাষার পরিণতি লক্ষ্য করে সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড-এর মতবাদ খানিকটা উপলব্ধি করা যাবে আশা করি। বাঙলা ভাষায় শিশু কথাটির স্ত্রীবাচক কোনো প্রতিশব্দ নেই। Infant ও child এই দুটি কথা ইংরেজীতে ক্লীব রূপেই ব্যবহৃত হয়। এই দুটি শব্দের কোনো স্ত্রীবাচক প্রতিশব্দও নেই। শিশুর বয়সকাল আমরা জন্ম থেকে ৫ বৎসর পর্যন্ত ধরেছি। Infant বলতে ইংরাজীতে প্রায় এক বৎসর বয়সের শিশু বোঝায়। child বলতে প্রায় ৪।৫ বছর পর্যন্ত ধরা হয়। তাহলেই দেখা যাচ্ছে ৪।৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, ইংরাজী-বাংলা কোনো ভাষায়ই দুইটি পৃথক দলের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। কিন্তু যেই শিশু শৈশব ছেড়ে বাল্যে উপনীত হলো, অমনি দুইটি দলের অস্তিত্ব আবিষ্কার করলেন ভাষাবিদগণ। বালকের স্ত্রীবাচক শব্দ এলো বালিকা, Boy-এর Girl। হঠাৎ পাঁচ বৎসর বয়সে এমন কি ঘটল যাতে দুই দলের অস্তিত্ব মেনে নিতে হলো? তাহলে নিশ্চয়ই ওদের ব্যবহারিক জীবনে এমন কিছু পরিবর্তন হয়েছে যা লোক চক্ষে ধরা পড়েছে। এই জন্যই

এই সময় থেকে দুই দলের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হয়েছে, ৯।১০ বৎসর পর্যন্ত অপেক্ষা করা সম্ভব হলো না। এখনদেখা যাচ্ছে যে আমাদের ধারণানুযায়ী ৯।১০ বৎসরের পরিবর্তে আমরা ৪।৫ বৎসরে এসে উপনীত হয়েছি। কিন্তু ফ্রয়েড-এর মতবাদানুসারে যৌনবোধের আরম্ভকাল আরো কিছু দিন এগিয়ে একেবারে শিশুর জন্ম মুহূর্ত থেকে। ফ্রয়েড মনঃ-সমীক্ষণের অভিজ্ঞতায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন এবং বহু মানসিক রোগীকে নিরাময় করে তাঁর মতবাদের সত্যতা প্রমাণিত করেছেন। যৌনবোধের এই মৌলিক অস্তিত্বকে মেনে নিয়ে আমরা যদি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বালক বালিকাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রণালী সুনিয়ন্ত্রিত করতে পারি তাহলে তারা ভবিষ্যতে নিশ্চিতভাবে পূর্ণ বিকশিত স্বভাবী (normal) মানুষে গড়ে উঠবে।

মানুষের প্রক্ষোভ (emotion)-এর বিষয়েও এ জাতীয় ক্রমোন্নতি বেশ লক্ষ্য করা যায়। মানবশিশু প্রথম অবস্থায় নিজের সুখবোধেই বিভোর থাকে, কি কারণে তার সুখবোধ হচ্ছে, কি করে সে সুখ উপভোগ করছে সে বিষয়ে তার কোন জ্ঞান থাকে না। সুখবোধ তার একমাত্র কাম্য বস্তু। এইরকম অবস্থা সাধারণত জন্ম থেকে এক বৎসর বয়স পর্যন্ত থাকে। তারপর ক্রমে সে বুঝতে শেখে যে কিভাবে তার সুখবোধ হবে, কোন্ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সে সুখ উপলব্ধি করতে পারবে ইত্যাদি। এর ফলে তার নিজের শরীরের দিকে নজর আসে এবং সে আত্মসুখপরায়ণ হয়ে ওঠে। স্বার্থপরতা এই অবস্থার একটা লক্ষণ। বাবা-মার কাছ থেকে আদর যত্ন পায় বলে সে আপন সুখের জন্যে বাবা-মাকে ভালবাসতে শুরু করে। এই সময়ে ভাইবোনের প্রতি বা অন্য বালক-বালিকার প্রতি সামান্য ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে ওঠে সে। এই অবস্থা প্রায় ৪।৫ বছর পর্যন্ত থাকে। তার পর একটু একটু করে সে বর্হিমুখী হয়ে ওঠে। সে খেলার সঙ্গীর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং ঘরের পরিবেশ ছেড়ে বাইরের দিকে এগিয়ে যায়। এই অবস্থা সাধাণত ৮।৯ বৎসর পর্যন্ত থাকে। তারপর তার আকর্ষণ একটা নির্দিষ্ট ধারা নেয়। এই সময়ে সে সমধর্মী ও সমদেহী বন্ধুবান্ধবের প্রতি অতিমাত্রায় আকৃষ্ট হয়, তাদের সঙ্গে মেলামেশায় খেলাধূলায় অনেকখানি সময় কাটাতে চায়। এই অবস্থা প্রায় ১৪।১৫ বৎসর পর্যন্ত থাকে। তারপর প্রক্ষোভের চরম পরিণতি আসে। এখানেই সে পূর্ণ মানব। প্রক্ষোভ বা অন্তর্বেগের ক্রম-বিকাশের যে বিবৃতি আগে বলেছি তা থেকে, আশা করি, একথা কেউ বুঝবেন না। যে, নূতন মনোভাব পূর্ববর্তী মনোভাবকে সরিয়ে দিয়ে নিজের স্থান করে নেয়। সমস্ত মনোভাবই বর্তমান থাকে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এক একটি বিশেষ মনোভাবের প্রকাশ কম বেশী হয়। পূর্ণতা তখনই বলা যেতে পারে যখন ভিন্ন ভিন্ন মনোভাবের একটা সুসামঞ্জস্য ঘটে। প্রক্ষোভের ক্রমবিকাশ ব্যাহত হলে অর্থাৎ মধ্য পথে বাধা পেলে মানসিক বৃত্তির বিকৃতি ঘটে এবং ফলে নানারূপ মানসিক অশান্তির কারণ ঘটে। এজাতীয় উদাহরণ আমরা প্রায়শই দেখতে পেয়ে থাকি।

প্রক্ষোভের মতই বুদ্ধিরও সুনির্দিষ্ট ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়। বুদ্ধি বলতে মনোবিদ্‌গণ এমন একটা শক্তি বোঝেন যার সাহায্যে আমরা আমাদের উদ্দেশ্য সাধনে কোন ভাব বা বস্তুর প্রাসঙ্গিক গুণ বা সম্পর্ক উপলব্ধি করতে পারি এবং তা থেকে প্রাসঙ্গিক ভাবের স্মরণ নিতে পারি।

প্রাত্যহিক জীবনে আমরা এমন অনেক বালকের সংস্পর্শে আসি, যাকে তার কার্যকলাপের জন্য

বলি বোকা অর্থাৎ সেই বয়সের অন্যান্য ছেলেরা যা বুঝতে বা করতে পারে সে তা পারে না। তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে একটা আনুমানিক মাপকাঠিতে ফেলে তার বুদ্ধি বিষয়ে বিচার করে বলি সে বুদ্ধিমান কি বোকা। এই মাপকাঠি কি ? একই বয়সের বহু সংখ্যক ছেলেমেয়ের আচরণ লক্ষ্য করে আমরা প্রতি বয়সের ছেলেমেয়েদের গড়পড়তা কর্মশক্তি ও ভাবশক্তি জানতে পারি। যে ছেলেটি ঐ বয়সের, কিন্তু তার কর্মশক্তি বা ভাবশক্তি আরো অল্প বয়সের ছেলেমেয়ের মত তখন আমরা তাকে বোকা বলে থাকি। ৬।৭ বছরে বালকবালিকারা কি করতে পারে তার দু'একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

১। অপরের সাহায্য ছাড়াই জামা গায়ে দিতে বা খুলতে পারে
২। গল্প শুনে নিজে গল্প বলতে চেষ্টা করে
৩। ঘর সংসারের সাধারণ জিনিসপত্রের নাম বলে পারে
৪। এক দুই করে পঁচিশ ত্রিশটা জিনিস গুণতে পারে
৫। তিন রকমের বিভিন্ন কাজ একেবার করতে বললে ঠিকমত করতে পারে।
৬। কিছু কিছু পড়তে ও লিখতে পারে
৭। সুন্দর ও বিশ্রী ছবি দেখালে কোনটি সুন্দর তা বলতে পারে।

যে ৬।৭ বছরের ছেলে উপরোক্ত কাজ করতে পারে না তাকে ঐ বয়সের স্বভাবী বালকের চেয়ে বোকা বলা হয়ে থাকে। আবার ৬।৭ বছরের যে ছেলে ৮।৯ বছরের উপযুক্ত মেধার পরিচয় দেয় তাকে বলা হয় খুব বুদ্ধিমান। অথবা তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন।

মানুষের অন্তর্জগতের এই বিচিত্র অথচ নিয়মতান্ত্রিক ক্রমবিকাশের দিকে নজর রেখেই আজ নানা অভীক্ষা (Test) পরিকল্পিত হচ্ছে। এই সমস্ত অভীক্ষার লক্ষ্য হলো মানুষের জীবন কি ভাবে আরো আনন্দময় ও উপভোগ্য করে তোলা যায়। মানসিক ক্রমবিকাশের দিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি রেখে আমরা যদি সন্তানের শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত করি তবে এ আশা অমূলক নয় যে আগামী দিনে আমরা অধিক সংখ্যক মানসিক স্বাস্থ্যসম্পন্ন নাগরিক লাভ করব।

জাতির মানসিকতার রূপায়ণে ইতিহাসের ভূমিকা

মোহম্মদ আবদুল করিম

'মানব মন'-এর পাতায় আর একবার ইতিহাস প্রসঙ্গের অবতারণা করলাম। বিষয়বস্তু অপ্রাসঙ্গিক নয়, বরং বর্তমানে খুবই প্রাসঙ্গিক এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মহাদেশ তুল্য বিরাট উপমহাদেশ আমাদের এই ভারতবর্ষ ভৌগলিক মানচিত্রে এবং শাসন ব্যবস্থায় একক একটি দেশ হলেও মনের বাঁধন আর মানসিক সংহতির দিক দিয়ে সর্বপ্রকারের পূর্ণ প্রকৃত ঐক্য লাভ করে নাই। দেশ দ্বিখণ্ডিত হওয়া তারই বীভৎস পরিণাম। তবুও ভাল, ভাগ হলেও দেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, মানস-গঠনের দিক দিয়ে বাঞ্ছিত সুফল ফলে নাই—জাতীয় সংহতির পথ সহজ সরল না হয়ে আরও জটিল হয়েছে। অতীতে মূলিত সাম্প্রদায়িকতার জেরতো আছেই, তার সাথে যোগ হয়েছে ভাষাগত চেতনার জাগরণ, অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত শ্রেণী ও প্রদেশের উন্নতি লাভের বাসনা। পরাধীনতার জোয়াল-মুক্ত এই শুভ জাগরণের উৎসরণ দেশের সামগ্রিক কল্যাণের অনুকূলে না হয়ে সৃষ্টি করেছে হিংসা বিদ্বেষ বিভেদ আর বিচ্ছেদ। অথচ দেশের সামগ্রিক উন্নতিসাধন আর দেশগঠনের জন্য জাতীয় সংহতি আর সমস্বার্থী দেশাত্মিক চেতনা একান্ত অনিবার্য ও আশু প্রয়োজন।

সামূহিক জাতীয় সংহতি বর্তমান সামাজিক ও অর্থনীতিক কাঠামোয় সম্ভব নয়। জাতীয় সংহতি সৃষ্টির পথে বাধাবিঘ্ন আছে অনেক প্রকারের। প্রকৃত ইচ্ছার অভাব যেমন আছে, ইচ্ছাকৃত বিভেদ সৃষ্টির নীতিও আছে তেমনি, সামাজিক আর অর্থনীতির কাঠামো পরিবর্তিত হয়ে গেলেও, মনের পরিবর্তন রাতারাতি ঘটবে না। মন আর মনোবৃত্তির পরিবর্তন সময় সাপেক্ষ এবং একাগ্রচিত্ত শ্রমসাধ্য ব্যাপার।

এই ভুল বোঝাবুঝি আর পুঞ্জীভূত বিদ্বেষ দূর করার একটি উপায় হল অতীত ঘটনাবলীর প্রকৃত রূপ উদ্‌ঘাটন করা, বিভিন্ন মনোভাবের ও সামাজিক পরিস্থিতির কার্য্যকারণ নির্ধারণ করে তার যথার্থ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা উপস্থিত করা—সোজা কথা, ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে উপস্থিত করা।

মিথ্যা, অর্ধসত্য, অতিরঞ্জন-অবরঞ্জনের কথা বাদ দিলেও, সত্য ঘটনাকে উপস্থিত করা আর তার অর্থ বা মর্ম ব্যাখ্যা করা এক কথা নয়। ঘটনার মূল্যগত গুরুত্ব এবং ভালো-মন্দ পরিণাম নির্ভর করে তার ব্যাখার উপর তাকে যেভাবে গ্রহণ করা বা বোঝা হয় তার উপর। তা ছাড়াও পরিণাম ও পরিণতি অনেকখানি নির্ভর করে একটি ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা অথবা

তাকে স্থান কাল-পাত্রের বিশেষ পরিস্থিতি আর পটভূমিতে সামগ্রিকভাবে দেখার উপর। ভারতবর্ষের ইতিহাসের ক্ষেত্রে এইখানেই সবচেয়ে বড় বিপত্তি ঘটেছে।

ভারতীয় সমাজ-মানসে অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাজনকে আবৃত করে যত প্রকার বিভেদ আর দ্বেষ রেষ ফুটে উঠেছে তার মধ্যে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাই হল সব চেয়ে পুরাণো। এই বিদ্বেষ যেমন সর্বশ্রেণিক ভাবে ব্যাপক, কুফল আর মর্মান্তিক পরিণামও তার তেমনি গভীর, কলংকপূর্ণ। এই জাতীয় সাম্প্রদায়িকতা মূলত এক পক্ষে মুসলমান এবং অন্য পক্ষে অমুসলমান সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ—অমুসলমান সম্প্রদায় বলতে অবশ্য হিন্দু সম্প্রদায়ই প্রধান, যদিও কার্যক্ষেত্রে পার্শী, য়ুহুদী আর এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান খৃস্টান ছাড়া আর সকল সম্প্রদায়ই তার মধ্যে গণ্য। ধর্মান্ধ মধ্যযুগে তার যা রূপ ছিল, বিজ্ঞানের যুগ এই বিংশ শতাব্দীতে তার রূপ তদপেক্ষা কম করাল নয়। এই কলংকময় আর শোচনীয় পরিস্থিতি যারা সৃষ্টি করেছিল আর আজও যারা তা টিকিয়ে রেখেছে, তারাই ইতিহাস থেকে প্রয়োজনীয় মালমসলা সুবিধামত বাছাই করে সুযোগ মত ব্যবহার করছে। ইতিহাস রচনার চিরাচরিত সেই দুষিত ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতির পরিবর্তন আজও তেমন হয় নাই, যদিও তার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে, প্রচেষ্টাও সে পথে শুরু হয়ে গেছে। তাতেও বাধা কিছু কম নয়।

ভারতের ইতিহাসে বিশেষ একটি ধর্ম বা সম্প্রদায়ের নাম হিসাবে 'হিন্দু' শব্দের ব্যবহার কবে থেকে হয়েছে জানি না, কারণ ভারতের বাহিরের য়ুরোপীয় ও আমেরিকার দেশগুলিতে আজও ভারতবাসী মাত্রকেই হিন্দু বলে; তাদের কাছে হিন্দু আর ভারতের বাসিন্দা সমার্থবোধক। তবে এটুকু বেশ সহজবোধ্য যে ইংরেজ আমলে তার বর্তমান নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার খুব প্রচলিত হয়েছে। ইতিহাস শিখিয়েছে, ভারত চিরন্তন হিন্দুর দেশ আর মুসলমানরা বিদেশী; হাজার হাজার বছরের সংস্কৃতির অধিকারী ভারতের মুসলমানরাই হল প্রথম বিদেশী আক্রমণকারী; বারো তের শ' বছর আগে ভারতে যে বিদেশীদের আক্রমণ হয়েছিল তারা আরব, তুর্কী, পাঠান, মোগল নয়, শুধুই মুসলমান। ইতিহাসের পাতায় পাতায় লেখা আছে, দেশ থেকে বিতাড়িত বা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে নতুন আশ্রয়ের সন্ধান বা নতুন সাম্রাজ্য স্থাপন নয়, হিন্দুর ধর্ম নাশ করা, কাফেরকে মুসলমান করা আর ইসলামের প্রসার সাধনই সে আক্রমণের উদ্দেশ্য, তাই দিকে দিকে মন্দির ধ্বংস করা আর হিন্দু হত্যা করাই ছিল তাদের প্রধান কাজ। ইতিহাসে লেখা আছে, ক্ষমতা দখলের যুদ্ধ আর খুনখারাবী, মধ্যযুগীয় তুর্কী-পাঠান নয়, মুসলিম আমলের বৈশিষ্ট্য। মধ্যযুগে সভ্যতা-সংস্কৃতির যে বিকাশ তা ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশের অংশ এবং পর্যায় নয়, তা মুসলমানদের ব্যাপার। তারা মুসলমান ছিল বলেই ভারত আক্রমণ করেছিল, পৌত্তলিকতার ধ্বংসের অভিযানে নেমে বেহেশতের সোপান গেঁথেছিল, আর মুসলমান বলেই তো হরদম নিজেদের মধ্যে সিংহাসন দখলের রক্তক্ষয়ী লড়াই চালিয়ে রেখেছিল।

ইতিহাসের এই অপব্যাখ্যা যে ইতিহাস-বিজ্ঞানের কত বড় অপব্যবহার, সে ধারণা সম্ভবতঃ সেই ইতিহাস লেখকদের নেই যাঁরা স্বীয় সংকীর্ণ মনোবৃত্তি ও সীমাবদ্ধ গোষ্ঠীর স্বার্থ চরিতার্থে নিবিষ্টচিত্ত। ভারতের ইতিহাসকে সাম্রাজ্যবাদ-রঞ্জিত আবরণ মুক্ত করে স্বচ্ছভাবে জানতে আর বুঝতে হলে অনেক কিছু ভেবে দেখার আছে। শুধু তাই নয়, সামগ্রিকভাবে ইতিহাসকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নতুন

দৃষ্টিতে দেখার, নতুন বিশ্লেষণী আলোকে বিচার করার প্রয়োজন আছে। তার জন্য তাত্ত্বিক ও তাথ্যিক মালমসলা উপাদানের দীনতা কয়েক দশক পূর্বের তুলনায়ও বহুল পরিমাণে কমে গেছে।

বর্তমান কালের পশ্চিমী তথা য়ুরোপীয় সভ্যতার শেখানো ভাষা আর পরিভাষার মর্মার্থে মধ্য ও প্রাগমধ্য-যুগীয় এশিয়ার ইতিহাসের ঘটনার বিচার বিবেচনা করা, আধুনিক মানদণ্ডে পৌরাণিক আর মধ্যযুগের পরিমাপ আর ব্যাখ্যা করা ঠিক সমাজ-বিজ্ঞানসম্মত হয় না। সমাজ ও শাসন ব্যবস্থা, ন্যায়-অন্যায়ের মানদণ্ড আর বিচার ব্যবস্থা কাল থেকে কালান্তরে পরিবর্তিত হয়েছে। কাজেই এক কালের এক যুগের ঘটনার বিচার করতে হবে সেই কালের সেই যুগের প্রচলিত ও সমাজ-গৃহীত মানদণ্ডের দ্বারা, ভাষা আর পরিভাষার অর্থ করতে হবে তৎকালীন ব্যবহৃত অর্থে, আজকের রূপান্তরিত শব্দার্থের ভিত্তিতে নয়।

হাজার হাজার বছর ধরে পর পর যারা ভারতে এসেছে বা সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে এবং দেশের বাসিন্দায় পরিণত হয়েছে, তারা সবাই একদিন ছিল বিদেশী, আক্রমণকারী, নবাগত—কেউ আগে এসেছে—কেউ বা পরে। ভারতের আদি বাসিন্দা যারা তাদের আজ সম্ভবতঃ খুঁজেই পাওয়া যাবে না। এই পর পর যারা এসেছে তাদের কাউকেই পথ হঠাৎ আবিষ্কার করতে হয় নাই, চেনা জানা পা-মাড়ানো পথেই তারা এগিয়ে এসেছে। কিন্তু এই বহিরাগত জাতিগুলি ভারতে এসে প্রবাসী হয়ে থাকেনি, থেকেছে নিবাসী হয়েই, ভারতবাসী হয়েই। তাদের একদা নিজের দেশের প্রতি যদিও বা কারও কিছুটা মমতা থেকে থাকে তা প্রবাসী বাঙ্গালীর বঙ্গদেশের প্রতি মনের টানের তুলনায় নগণ্য। সে-কালে এই ছিল রীতি, শুধু ভারতেই নয়, এশিয়ার অন্যান্য দেশে ও য়ুরোপেও—ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্মনী, স্পেন ইত্যাদি—কাকে তাড়িয়ে কে ঘর বাঁধবে তারই সংগ্রাম।

সকল দেশের মত সে-কালে ভারত ভূমিতে খণ্ড খণ্ড রাজ্যই ছিল—গোটা ভারতবর্ষ কারও মাতৃভূমি ছিল না। ভারতবর্ষ ভারতবাসীর মাতৃভূমির রূপ নিয়েছে মাত্র সেদিন। ভারতের জনগণকে "আমাদের জনগণ" বলার অবস্থা ও মানসিক চেতনা সৃষ্টি হয়েছে মোগল আমলেরও পরে—খুব জোর তার পতনের সময় থেকে। তা ছাড়া ভাষাভিত্তিক জাতির উৎপত্তি নেহাৎই এই যুগের কথা—ইতিহাসের ভাষায় যাকে বলে 'আধুনিক যুগ'। সে-কালে এক একজন রাজা বা সম্রাটের অধিকৃত অঞ্চলই ছিল 'দেশ', তার বাইরে পা বাড়ালেই বা তার সীমার মধ্যে প্রবেশের প্রচেষ্টা করলেই তা হত একের বা অন্যের ক্ষেত্রে আক্রমণমূলক কাজ, সাম্রাজ্য বিস্তারের লড়াই। সাড়া ভারত নিয়ে কারও মাথা ব্যথা ছিল না, সকলেরই চিন্তা ছিল নিজের রাজ্য কায়েম রাখা বা রাজ্য বিস্তার করা নিয়ে। ভাষা আর অর্থনীতিকে ভিত্তি করে সীমিত রাজ্য গড়ে ওঠা অনাদি কালের চিরন্তন ব্যবস্থা নয়, সামাজিক বিবর্তনের একটা সর্ব-সাম্প্রতিক স্তরমাত্র। ক্রমবিকাশের এই স্তরের পূর্বে তার চেতনাও ছিল না, থাকলেও ছিল আবছা, অস্পষ্ট, অঙ্কুরীয়। কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে চেতনারও বিকাশ হয়, পরিস্থিতির প্রয়োজনের সার আর সেচনের সাহায্যে চেতনার স্বচ্ছতা, সম্প্রসারণ আর পরিপক্কতা হয়। জাতি হিসাবে ভারত-বাসীর এই চেতনার জাগরণ এই নিয়মের ব্যতিক্রমে ঘটেনি। আজও সর্বভারতীয় জাতীয়তাবোধ পরিপূর্ণতা লাভ করেনি। ভাষা, সংস্কৃতি আর ধর্মভাবগত অংশীয় 'দেশপ্রেম' তাই আজও

মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে—সামগ্রিক ভারতীয় সংহতির সহায়রূপে নয়, বিভেদ-বুদ্ধির উন্মত্ত উত্তেজনা রূপে।

অথচ আমাদের ইতিহাসবেত্তারা এমনভাবে ভারতের ইতিহাস রচনার ভূমিকা শুরু করেন যেন সারা ভারতের ভাব-ভাষা-সংস্কৃতিগত মিলটা মৌলিক ও শাশ্বত। ভাষাগত মিল আর ঐক্য যা ছিল, তার সাথে রাষ্ট্রীয় ঐক্যের কোন সায় ছিল না। বাসনা থাকতে হয় তো পারে, কিন্তু বাসনা বাস্তবের সামিল নয়। ভারতের অতীত কালের কবি আর দার্শনিকরা যে বলেছেন, "সহস্র যোজনী ভূখণ্ড যাহা হিমালয় হইতে সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত তাহা একক একটি সম্রাটের উপযুক্ত রাজ্য", সেটা বাসনার অভিব্যক্তির অধিক কিছু নয়। আর তাও কি সত্য শুধু ভারতের ক্ষেত্রে? য়ুরোপের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত এমনি মিলের নমুনা কি আর মিলবে না? এই দুয়ের ক্রমবিকাশের রূপ ও ধারার যে প্রভেদ তারই ফলে বহু ভাষাভাষীর দেশ ভারত তবুও একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে, য়ুরোপ বিভক্ত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে। য়ুরোপের ইতিহাসে ভাষাগত চেতনার বৃদ্ধির সাথে সাথে গড়ে উঠেছে রাষ্ট্রীয় বিচ্ছিন্নতা, তার বিপরীতে ভারতের ইতিহাসে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবোধ জেগেছে একক রাষ্ট্র বিকাশের পথে সামগ্রিক চেতনার উন্মেষের সাথে সাথে। কাজেই, বলা যায় যে, ভারতের ইতিহাস লেখকরা ভৌগোলিক ভারতের সামগ্রিক ঐক্যের পথে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্রমবিকাশের ধারা দেখান না, তাঁরা প্রতিষ্ঠা করতে চান একক সনাতন ভারতরাষ্ট্রকে তার ভেদ-বিভেদ উত্থান-পতনের বর্ণনা করে। অথচ ঘটনাগুলির বয়ানে তা প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাই অনেক ক্ষেত্রে দ্বিধারূপী স্ববিরোধী মন্তব্য প্রকাশ পায়। দৃষ্টিকোণের পার্থক্যে তাই ইতিহাসের ঘটনাবলীর মূল্যায়ন, আর সিদ্ধান্ত ভিন্নরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

[ক্রমশঃ]

পাভলভ ও বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ

পাভলভ ছিলেন মনে প্রাণে বস্তুবাদী। শেরিংটন ঠিকই বুঝেছিলেন এবং তাই বলেছিলেন—পাভলভের মস্তিষ্ক-বিজ্ঞানের ইংলণ্ডে ঠাঁই হবে না। তাঁর আবিষ্কৃত শর্তাধীন পরাবর্তক্রিয়া একান্ত ভাবে বস্তুসাপেক্ষ। মস্তিষ্কের বৃত্তি সম্পূর্ণভাবে মস্তিষ্কের অবয়বের উপর নির্ভরশীল। সেখানকার সমস্ত জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বস্তুভিত্তিক। পাভলভের মতে মানসিক কোন অবস্থাই স্থান-কালের গণ্ডীর বাইরে পড়ে না এবং তাঁর গবেষণার সব কিছুই বিষয়গত ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। প্রাকৃত বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতই মানস-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও চলছে বাস্তব ঘটনার অনুশীলন ও নিয়ম অনুসন্ধানের ব্যাপার। বস্তুবাদীদের মতে বস্তু আদি ও প্রাথমিক, ভাব বস্তুসঞ্জাত ও বস্তু-নির্ভর। পাভলভ বলেছেন—'মনন-ক্রিয়া মস্তিষ্কের অংশ বিশেষের উদ্দীপনার ফল', আরও বলেছেন—'চৈতন্য সম্পূর্ণভাবে মস্তিষ্ক নির্ভর'।

বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের আর একটি সূত্র—জগতের সব কিছুই বিষয়গত ও বাস্তব। জাগতিক নিয়মকানুনও বাস্তব। জগৎকে জানবার ও বোঝবার জন্য জগতের বাইরের কোন কিছু আমদানী করা অপ্রয়োজনীয়। এংগেলস বলেছেন, বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে বাস্তব ধারণার মানে বিশ্বপ্রকৃতি যেমন আছে তাকে ঠিক তেমনিভাবে মেনে নেওয়া। আর পাভলভ বলেছেন, প্রাকৃত-বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে মানব মস্তিষ্কের সাহায্যে প্রকৃতিকে জানবার চেষ্টার মধ্য দিয়ে, প্রকৃতির বাইরের কোন কিছু দিয়ে ব্যাখ্যা না করে।

পাভলভ শুধু এই কথাগুলো বলে থেমে থাকেন নি। প্রাকৃত বিজ্ঞানীদের মত তিনিই প্রথম তথ্য প্রমাণ দিয়ে দেখালেন যে, মানসিক ক্রিয়াকলাপ বাস্তব পরিস্থিতি ও পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। কোন বিশেষ শক্তি [দৈবশক্তি, প্রাণশক্তি ইত্যাদি] কল্পনার প্রয়োজন নেই মনন ক্রিয়ার স্বরূপ বুঝতে। 'আকস্মিকতার আশ্রয় নিতে হবে না চৈতন্যর উন্মেষ ব্যাখ্যায়। কুকুর ও শিম্পাঞ্জী-মস্তিষ্কের ওপর অনেক বছর ধরে পরীক্ষানিরীক্ষা করে তিনি এই সত্যে পৌঁছেছিলেন। পরীক্ষার ফলে পাওয়া অভ্রান্ত তথ্য-প্রমাণের হাতিয়ার নিয়ে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অবিশ্রান্তভাবে ভাববাদীদের শেষ আশ্রয়-দুর্গের সেনাপতিদের আক্রমণ করে গিয়েছেন। দ্বয়বাদী শেরিংটনকে, 'বিশেষ প্রাণ-শক্তি'বাদী কোহলারকে, ল্যাসলীকে—কাউকে তিনি ক্ষমা করেন নি। এঁরা সবাই ছিলেন সেকালের সেরা বৈজ্ঞানিক। কেউই পাভলভের আক্রমণের উপযুক্ত জবাব দিতে পারেন নি। তাঁর চোখা-চোখা বাণের একটা নমুনা এখানে দিচ্ছি।—কোহলার আত্মার আকস্মিক বিকাশে বিশ্বাসী। কিছুতেই তিনি ভাবতে পারছেন না

যে, তাঁর এই 'আত্মা'কে হাতে চেপে ধরে পরীক্ষাগারে নিয়ে আসা যায়, এই আত্মার ক্রিয়াকলাপ কুকুরের ওপর পরীক্ষা করলেই সঠিক জানা যায়। তিনি প্রমাণ পেলেও মানবেন না একথা। শেরিংটনও ঠিক এই রকম আর একজন। প্রকৃতি জগতের বাইরে অদ্ভুত একটা কিছু কোন বৈজ্ঞানিককে খুঁজতে দেখলে পাভলভ তাকে ক্ষমা করতে পারেন নি। বস্তুবাদীদের মতে জগতের কোন কিছুই একক বা বিচ্ছিন্ন নয়, সব কিছুই পরস্পর সম্পর্কিত ও পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং প্রাকৃতিক কোন ঘটনাকেই বিচ্ছিন্ন ভাবে বোঝা যায় না। পরিবেশের পরিবর্তনে ঘটনার পরিবর্তন ঘটে। পাভলভের পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিশেষ ধারাটি এই সূত্রসম্মত। যান্ত্রিক জড়বাদীদের থেকে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট তাঁর গবেষণার মৌলিক পদ্ধতিটি। এই পদ্ধতিকে বলা হয়েছে chronic method। প্রাণীটির সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আন্তর-যন্ত্রাদি যথাযথ স্থানে রেখে, সুস্থ প্রাণীর ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন পাভলভ। বিচ্ছিন্নভাবে মস্তিষ্কের অংশবিশেষের ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ করাকে তিনি যান্ত্রিক ও অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলে মনে করতেন। পাভলভের পদ্ধতি ডায়েলেকটিকস্ পদ্ধতি। পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই প্রকৃতির আসল স্বরূপ ও পরিবর্তনের কারণ উদঘাটিত হয়েছে। পাভলভের মতে মস্তিষ্কের বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, উত্তেজনা, নিস্তেজনা, উদ্দীপনার প্রসার, সঙ্কোচন ইত্যাদি সমস্তই পরস্পর সম্পর্কিত ও পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। তিনি বলেছেন, মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ পরস্পর সম্পর্কিত এবং এক অপরের দ্বারা সর্বদাই প্রভাবিত। এই চলমান ক্রিয়াশীল মস্তিষ্ক, স্নায়ুতন্ত্রের অন্যান্য অংশের সঙ্গেও অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত এবং এই সব বিচ্ছিন্ন অংশকে নিয়ত প্রভাবিত করছে, আবার এদের দ্বারাও প্রভাবান্বিত হচ্ছে। "যদিও আমরা মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের বিচ্ছিন্ন বিবরণ দিয়েছি, তবু মনে রাখা দরকার এই সব ক্রিয়াকলাপ যুক্তভাবে, মিলিতভাবে, অবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে।"—পাভলভ।

বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের আর একটি সূত্র—বিশ্ব প্রকৃতি সব সময় গতিশীল। সনাতন ও শাশ্বত বলে জগতে কিছু নেই। জন্ম-বৃদ্ধি-মৃত্যু—এই হচ্ছে নিয়ম।

উচ্চ মস্তিষ্কের বিশিষ্ট যে ধর্মটি পাভলভ আবিষ্কার করেন—সেটি এই গতিশীলতা।—"'Processes are in incessant motion, formation, development and disappearance।" সব সময়েই সেখানে কিছু জন্মাচ্ছে, বাড়ছে, আবার ধ্বংস হচ্ছে। অসাধারণ বৈচিত্র্যময়, ভঙ্গুর ও পরিবর্তনশীল মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ। বহির্বাস্তব বা আন্তর যন্ত্রের (external and internal environment) সামান্যতম পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কে নতুন তরঙ্গ ওঠে। বিচ্ছিন্ন ভাবে ও সামগ্রিক ভাবে মস্তিষ্ক পরিবর্তিত হয় নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে। পুরনো অভ্যাস ভেঙ্গে পড়ে, নতুন অভ্যাস জন্ম নেয়। মস্তিষ্কের এই গতিশীলতা ও পরিবর্তন ক্ষমতা প্রাণীকে বাঁচিয়ে রাখে। এই গতিধর্মের দৌলতেই প্রাণীজগতে বিবর্তন সম্ভব হয়েছে। বৈচিত্র্যের জন্ম হয়েছে। সমস্ত শর্তাধীন পরাবর্তই, ভঙ্গুর, পরিবর্তনশীল ও পরিবেশ নির্ভর।

পরিবর্তনের স্বরূপ ও প্রকৃতি ব্যাখ্যায় বস্তুবাদ বলে যে পরিবর্তন সব সময় একই দিকে নির্দিষ্ট মাত্রায় ঘটবে এমন কথা নেই। একটা নির্দিষ্ট তাপ মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে কাঠ পুড়ে কয়লা হয়। আরও মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে শুধু ধোঁয়ায় রূপান্তরিত হয়। একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ছাড়িয়ে গেলে বারুদে

বিস্ফোরণ ঘটে, জল বরফে পরিণত হয়। ডায়ালেকটিকসের ভাষায় Quantitative changes are converted into qualitative changes.

পাভলভ দেখিয়েছেন, মস্তিষ্কের বেলায়ও সূত্রটি পুরোপুরি খাটে। পাভলভের পরীক্ষাগারে লব্ধ অভ্রান্ত তথ্য-প্রমাণাদি বস্তুবাদের মর্যাদা বাড়িয়েছে। উচ্চ মস্তিষ্কের প্রাথমিক ধর্ম—শর্তাধীন পরাবর্ত ক্রিয়ার প্রকাশ মাত্রাগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তনের বিশিষ্ট নিদর্শন। খাবার দেবার সময় ঘণ্টা বাজানো হচ্ছে। একদিন, দু'দিন, তিনদিন গেল ঘণ্টার শব্দে কুকুরের লালা ঝরছে না। সে সাড়া দিচ্ছে না। দশ কি বার দিন পরে দেখা গেল মস্তিষ্কের গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে। শুধু ঘণ্টার শব্দেই কুকুরের লালা ঝরছে। ঘণ্টার উদ্দীপনা ক্রমশঃ পথ করে খাদ্য-উদ্দীপনার কেন্দ্রের দিকে এগুচ্ছিল। যতক্ষণ না দুটো কেন্দ্রের যোগাযোগ ঘটেছে—ততদিন এটা ছিল মাত্রাগত পরিবর্তন। যোগাযোগ হবার সাথে সাথে ঘটল গুণগত পরিবর্তন।

মস্তিষ্কের এই ধরনের গুণগত পরিবর্তনের অনেক উদাহরণ পাভলভ দিয়েছেন। আরও একটা বলছি। সাধারণ নিয়মে উদ্দীপকের জোর বা মাত্রা যত বাড়বে প্রতিক্রিয়ার ফল ততই বেশী হবে। এটা চলে গাণিতিক নিয়মে। ধরুন দশ মাত্রা উদ্দীপক কাজ করলে ১০ ফোঁটা লালা পড়ল। ২০ মাত্রা উদ্দীপকের ফলে পড়বে ২০ ফোঁটা, ৩০ মাত্রায় ৩০ ফোঁটা ইত্যাদি। কিন্তু এমন একটা অবস্থা আসবে (কখন আসবে সেটা নির্ভর করছে মস্তিষ্কের শক্তি ও অবস্থার ওপর) যখন দেখা যাবে মাত্রা বাড়ালে ফল আর বাড়ছে না। ৬০ মাত্রায় ৬০ ফোঁটা লালা পড়েছে। ৭০ মাত্রাতেও ৬০ ফোঁটা পড়ল। আরও মাত্রা বাড়ালে দেখা যাবে ফল কমতে সুরু হয়েছে। ৮০ মাত্রায় পড়ল ৩০ ফোটা লালা। আরও বাড়ান গেল মাত্রা। বিপরীত অবস্থা এসেছে। লালা মোটেই পড়ছে না। কুকুর খাবারের জায়গার দিকে মুখই ফেরাচ্ছে না। মাত্রাগত পরিবর্তন গুণগত পরিবর্তন এনে দিয়েছে। সদর্থক উদ্দীপক নঙর্থক উদ্দীপকে রূপান্তরিত হয়েছে। মস্তিষ্কের আলট্রা প্যারাডক্সিক্যাল অবস্থা ঘটেছে।

সবশেষে অতি পরিচিত দ্বন্দ্বের কথা। প্রাকৃতিক প্রত্যেকটি ব্যাপারে ও ঘটনায় সর্বত্র চলছে বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব। ···সেই দ্বন্দ্ব থেকে ঘটছে নতুনের জন্ম, বৃদ্ধি ও পরিণতি। মস্তিষ্কের যাবতীয় বৃত্তি দুই বিপরীত ক্রিয়ার ঘাত-প্রতিঘাত থেকে উদ্ভূত এই হচ্ছে পাভলভ মস্তিষ্ক-বিজ্ঞানের মূল কথা। উত্তেজনা ও তার বিপরীত নিস্তেজনা এই দুই বিপরীত ক্রিয়া সব সময়েই চলেছে মস্তিষ্ক কোশে। উত্তেজনা কিছুক্ষণ চলার পর সেইস্থানে নিস্তেজনা তরঙ্গ নেমে আসছে। মস্তিষ্কের এক জায়গা উত্তেজিত হলে তার আশে-পাশের জায়গাগুলো নিস্তেজ হয়ে আসছে। তেমনি আবার নিস্তেজনা মিলিয়ে গেলে উত্তেজনায় রূপান্তরিত হচ্ছে। একই সময় মস্তিষ্কের একস্থান বেশী উত্তেজিত, অন্য স্থান কম উত্তেজিত, আবার কিছুটা জায়গা একেবারে নিরুত্তেজিত। উত্তেজনা থেকে নিস্তেজনাকে আলাদা করে দেখা যায় না। এরা দুয়ে মিলে এক। পরস্পরের সংঘর্ষ চলেছে—রূপান্তর চলেছে। এরই ফলে নতুন-নতুন শর্তাধীন পরাবর্ত প্রকাশ পাচ্ছে। প্রাণী নতুন নতুন গুণের অধিকারী হচ্ছে। পরীক্ষালাভে লব্ধ অভ্রান্ত তথ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত পাভলভের এই দ্বন্দ্বতত্ত্ব। বস্তুবাদকে সমৃদ্ধ করার আর একটি প্রমাণ।

পাভলভের মতে—এই দুই ক্রিয়ার সমতা, মাত্রাগত বিভিন্নতার ওপর নির্ভর করছে আমাদের সুস্থ ও অসুস্থ অবস্থার সামগ্রিক আচরণ। উনিশ শতকের প্রাকৃত বিজ্ঞানের নতুন-নতুন আবিষ্কারের ফলে বস্তুবাদ নতুন রূপ নিল। মার্কস-এংগেলস্ প্রকৃতির নিয়মের মধ্যে ডায়ালেকটিকসের সন্ধান পেলেন। ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞান পেল নতুন পথের নিশানা। লেনিনের নেতৃত্বে ঘটল বিপ্লব, প্রথম বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনায় নতুন সমাজপ্রতিষ্ঠা। পাভলভের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মানুষের মনোজগতের ক্রিয়াকলাপের নিয়মের সন্ধান দিয়েছে। বস্তুবাদকে আরও সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছে, সমৃদ্ধ করেছে। শুধু প্রকৃতি নয়, মনকেও বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনায় পরিবর্তিত করা যায়।

নতুনতর বিপ্লবের প্রতীক্ষায় মানুষ দিন গুনছে। দেউলিয়া ভাববাদ হাতিয়ার খুঁজছে—আদর্শের হাতিয়ার। কিন্তু পাচ্ছে না। জেমস্-মেণ্ডেল-মরগ্যান-ফ্রয়েডের দল পরাজিত হয়েছে। আর তারা ফিরে আসবে না। কিন্তু আত্মতুষ্টি অমার্জনীয় অপরাধ। ভাববাদ বিভিন্ন ছদ্মবেশে বারবার হানা দিচ্ছে। আমাদের সব সময়ে সজাগ থাকতে হবে। চালিয়ে যেতে হবে অক্লান্তভাবে আদর্শগত সংগ্রাম।

জীবনদর্শন ও চিকিৎসা বিজ্ঞান

ইউ. আখ্মেরভ

আমাদের ক্লিনিকের একটি নূতন রোগিনীর কাহিনী দিয়ে শুরু করছি। এই তরুণীটি কিছুদিন পূর্বেও অটুট স্বাস্থ্য উচ্ছল প্রাণশক্তির অধিকারী ছিল। কিছু দিন থেকে সে আকস্মিকভাবে অসুস্থ হ'য়ে পড়ে। চলতে ফিরতে ক্রমশই বেশী ক্লান্তি অনুভব করে, হাত পা কাঁপতে সুরু করে, সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যেরও দ্রুত অবনতি ঘটে।

এই লক্ষণগুলি স্নায়ুতন্ত্রের একটি কঠিন ব্যাধির প্রকাশ। ঐ রোগকে মাল্‌টিপল সক্লেরোসিস (multiple sclerosis) মানে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুদণ্ডের বিভিন্ন স্থানে কাঠিন্য বলা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই রোগে অনিবার্যভাবে মানুষ সম্পূর্ণ পঙ্গু হয়ে পড়ে। ডাক্তারেরা যথাসাধ্য চেষ্টায় অতি আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করে রোগের উপশম ঘটিয়েছিলেন, রোগিনীর যথেষ্ট উন্নতিও হয়েছিল।

একটি চিকিৎসা বিষয়ক আলোচনা বৈঠকে এই রোগিনীর ইতি বৃত্তান্ত উত্থাপন করে তাঁদের চিকিৎসার তারিফ করা হ'য়েছিল। জনৈক ডাক্তার তাঁদের বক্তব্য মেনে নিলেন না, প্রশ্ন করলেন, "ঐ চিকিৎসার ফলেই যে রোগিনীর উন্নতি হ'য়েছে তার প্রমাণ আছে কি?" প্রশ্ন করেই ক্ষান্ত হ'লেন না, তিনি আরও জানালেন, কেন ঐ রোগের উপশমের ঠিক কারণ নির্ণয় করা সব সময়ে সম্ভব নয়। কারণ এই শ্রেণীর ব্যাধিগুলিতে আপনা হ'তেই রোগভোগের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে রোগিনীর উন্নতি ও স্বাভাবিক নিয়মে হ'য়ে থাকতে পারে, চিকিৎসার বিশেষ কোন প্রভাব হ'য়ত ছিল না।

এই সব মন্তব্য যদি ঐ রোগীবিশেষের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ হ'ত তা'হলে এত কথা উল্লেখের প্রয়োজন হ'ত না। কিন্তু এই শ্রেণীর অন্য অনেক ব্যাধির ক্ষেত্রেও ঐ একই প্রশ্ন উঠে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কতকগুলি বংশানুক্রমিক ব্যাধির সম্বন্ধে কিছু ডাক্তারের যুক্তি ও মতামত বিবেচনা করলে দেখা যাবে তাতে কী হতাশা, তাঁদের অন্যান্য সহকর্মীদের সফল পরীক্ষা কার্যের উপর কত অবিশ্বাসই না প্রকাশিত হ'য়েছে।

এই রকম এ্যামাওট্রাপিক ল্যাটেরাল সক্লেরোসিস (amyotropic laleral sclerosis) নামে স্নায়ুতন্ত্রের আর একটি গুরুতর ব্যাধির ক্রমবর্দ্ধমান ভোগ ও সাময়িক ভাবে রোধ করা যেতে পারে, শক্তিশালী ভাইটামিনাদি প্রয়োগ করে রোগীর অবস্থার উন্নতিও দেখান যেতে পারে। অতি উৎসাহী ডাক্তারেরা নিজেদের চিকিৎসা পদ্ধতিকে নবতর ও উন্নততর বলেও জাহির করতে পারেন। কিন্তু তাতে আসল সমস্যার সমাধান কতটুকু হ'য়েছে। কিছু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হয়তো বলবেন

"এ সব ব্যাধির চিকিৎসা অতি নৈরাশ্যজনক। যদি রোগভোগের কিছু উপশম হয়ও ত বুঝতে হ'বে রোগ নির্ণয়েই ভুল আছে।

এখন চিন্তা করে দেখুন নিজেদের উদ্দমকে সম্পূর্ণ নৈরাশ্যজনক ধরে নিয়ে কোন বৈজ্ঞানিকই কি নূতন নূতন পন্থা ও পদ্ধতির অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে পারেন ? নিজের চিকিৎসার সাফল্যের উপর বিশ্বাস না রেখেই কি কোন চিকিৎসক সক্রিয়ভাবে, উৎসাহের সহিত তাঁর রোগীর চিকিৎসা করতে পারেন ?

প্রশ্ন উঠে বিজ্ঞানের আধুনিক দ্রুত উন্নতির দিনে কেনই বা কিছু বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকের মুখ থেকে নব নব সৃজনশীল চিন্তাধারার বিরুদ্ধে তাঁদের স্বকীয় সন্দেহবাদের প্রচার শোনা যায়। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আরও কঠিন। আধুনিক কালে এ্যান্টিবায়োটিক (antibiotic) ও হরমোন (hormone) চিকিৎসা, রোগ সংক্রমণ ও অকাল বার্দ্ধক্যের বিরুদ্ধে অভিযানের দিনে চিকিৎসাও রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বহুবিধ উন্নতি সাধিত হ'য়েছে। এই সব উন্নতির ফলে সন্দেহের অবসান হওয়া উচিত ছিল কিন্তু সে আশা সফল হয়নি, সন্দেহবাদের ভিত্তি স্পষ্টতই আরো সুদৃঢ়। এর কারণ কি ? এই প্রশ্নেরই উত্তর দিতে চেষ্টা করব।

হিপোক্রেটিস (Hippocretes) লিখে গিয়েছেন যে চিকিৎসা শাস্ত্রের ক্ষেত্রে দার্শনিক তত্বের প্রয়োগে, চিকিৎসা ও দর্শন, উভয় শাস্ত্রই সমৃদ্ধ হ'তে পারে। প্রকৃতি বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, শরীর বিজ্ঞান ও বিশেষ করে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে বিজ্ঞানের উন্নতির ক্ষেত্রে তত্বগত নীতির গুরুত্ব সবিশেষ প্রতিপন্ন করা যায়। বহু দার্শনিকই বিচক্ষণ চিকিৎসক ছিলেন আবার সর্বকালের বহু শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকেরাও ছিলেন বড় দার্শনিক। এই প্রসঙ্গে অভিসেনা (Avicena), গ্যালিলিও, লামেত্রিয়ের নাম উল্লেখই যথেষ্ট।

সেচেনভ, মেস্‌নিকভ, বট্‌কিন্‌, প্যাভলভ, ভেডেংস্কি, আখটম্‌স্কি প্রমুখ রুশীয় জীব বিজ্ঞানের নূতন ভাবধারা ও ক্লিনিকের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্ববিখ্যাত প্রগতিবাদী ও বস্তুবাদী মহাপুরুষেরা প্রগতিশীল দার্শনিক না হলে কি আর তাঁদের ঐ সব অভিনব আবিষ্ক্রিয়া করতে পারতেন ?

সব কাজেরই কারণ নির্ণয় করা যায়, যে কোন ব্যাধিরই চিকিৎসা থাকা ও করা সম্ভব, নীতিগত ভাবে রোগ নিরাময় এবং সফল প্রতিরোধ করাও যেতে পারে, এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেই সোভিয়েত চিকিৎসা বিদ্যা অগ্রসর হচ্ছে। আজ যা অজানা চেষ্টা করলে কাল তা জানা যাবেই !

অধুনা চিকিৎসা জগতে বস্তুবাদী ও বিভিন্ন ভাববাদী প্রবণতার মধ্যে কঠিন দ্বন্দ্ব চলেছে।

কেউ কেউ আদিম কাল থেকে প্রচলিত প্রতিক্রিয়াশীল ধারণা সমুহ আঁকড়ে রয়েছেন। তাদের মতে প্রাণীদেহের কতকগুলি জন্মগত বৈশিষ্ট্যের জন্য ব্যাধির উৎপত্তি হয়। অন্যেরা আবার এমন কতকগুলি অন্তর্নিহিত পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট বিধিকে ব্যাধির উৎপত্তির কারণ বলেন যা রিজ্ঞানের সাহায্যে ধরা পড়ে না। তারা বলেন সেই সব বিধি ও প্রক্রিয়া আমাদের সম্পূর্ণ প্রভাবাধীন নয় এবং সেজন্যই সকল চিকিৎসার সম্ভাবনায় তাঁদের অবিশ্বাস। তাঁরা শুধু ব্যাধির বাহ্যিক রোগ লক্ষণ বর্ণনা করেই ক্ষান্ত

থাকেন ; রোগের আসল কার্য্যকারণ সম্বন্ধ খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা ও চোখে পড়ে না। স্নায়বিক ও মানসিক ব্যাধির ক্ষেত্রেই এই অবস্থা বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়।

বিদেশের প্রতিক্রিয়াশীল দর্শনতত্ত্বগুলি সেখানকার উপরতলার শ্রেণীস্বার্থই প্রতিফলিত করে। মানব দেহের জন্মগত বৈশিষ্ট্যগুলিই তাদের রোগ ভোগের কারণ ব'লে প্রচার করা হয় এবং এই উপায়েই ধনতন্ত্রবাদী জগতের সমস্যাসংকীর্ণ সমাজের স্বরূপ লুকিয়ে রাখা হয়।

একমাত্র বিজ্ঞান সম্মত মার্কস-লেনিন প্রবর্ত্তিত দর্শনতত্ত্বই মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য রক্ষার সংগ্রামে চিকিৎসকদের সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরি অস্ত্রে সজ্জিত করেছে। কিন্তু তবুও তাঁরা এর যথাযথ সদ্ব্যবহার করেন না। সেই জন্যই আমরা মাঝে মাঝে শুনতে পাই "চিকিৎসাক্ষেত্রে দর্শনতত্ত্বের কী প্রয়োজন ? দর্শনের নীতি ত আর চিকিৎসাবিদ্যার স্থান নেবে না"। ক্লিনিকগুলির কাজ কর্ম্ম এমন ভাবে সংগঠিত করা যেতে পারে যাতে করে ছাত্রদের দর্শনতত্ত্ব সমূহের জ্ঞান দৃঢ়বদ্ধই হবে না অধিকন্তু সঙ্গে সঙ্গে গভীরতর, বাস্তবানুগ ও বিস্তৃত হয়ে উঠবে।

আমরা এখানে এক অদ্ভুত অবস্থার সম্মুখীন হ'ই। আমাদের মেডিকেল কলেজের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপকেরা সাধারণতঃ চিকিৎসা শাস্ত্রের বিষয়ে কিছুই জানেন না। তারা বড়জোর ছাত্রদের মার্কস-লেনিন বাদের ভিত্তি স্বরূপ অতি সাধারণ তত্ত্ব সমূহের ধারণা জন্মিয়ে দেন। আবার ক্লিনিকের শিক্ষকদেরও দর্শন শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকে না। তাঁদের দেওয়া বক্তৃতামালা ও চিকিৎসা বিষয়ক ধ্যান ধারণা এমন কি রোগ শয্যাপার্শ্বের হাতে কলমে কাজ ও জীববিজ্ঞান বা দর্শনের নিয়ম ভিত্তিক কোনও সাধারণ সিদ্ধান্তে পেঁছিয় না।

রোগ নির্ণয়নকে একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পর্যায়ে ফেলার শিক্ষা এখনও পর্য্যন্ত তরুণ চিকিৎসকদের দেওয়া হয় না এবং পরবর্ত্তী সক্রিয় ধ্যান ধারণা ও তৎসংশ্লিষ্ট বিমূর্ত্ত সিদ্ধান্তগুলি থেকে প্রয়োগযোগ্য কার্য্যক্রম স্থির করতে সাহায্য করাও হয় না।

রোগ নির্ণয়ের ব্যাপারে আমরা কি সমস্ত তথ্য ও রোগ লক্ষণগুলির পূর্ণ ব্যবহার করি ? আমরা কি সব সময় রোগীর অভিযোগ সমূহের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে থাকি ? না, সব সময়ে ত নয়ই। রোগীর অভিযোগগুলি তার বিষয়ীগত অনুভূতি (নিজস্ব কল্পনা প্রসূত) বলে মনে করি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সব রকম ব্যথা বেদনা বা অস্বস্তিকর অনুভূতিই ত মানব দেহের মধ্যে কিছু একটা ঘটছে তারই কোনরূপ প্রতিফলন, কিছু একটা শারীরিক বিশৃঙ্খলার বিশিষ্ট সংকেত।

কোনও একটি বিশেষ রোগীর ক্ষেত্রে কোনও চিকিৎসা বিষয়ক প্রশ্ন বা সমস্যার সমাধান সঠিক ও বোধগম্যভাবে করা যেতে পারে কেবল মাত্র প্রকৃতি বিজ্ঞানের একটি সাধারণ তথ্য 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের' ভিত্তিতে।

দর্শনশাস্ত্রের যথেষ্ট জ্ঞানের অভাব থেকেই যত সব অন্ধ বিশ্বাস ও আদিম প্রক্রিয়ার প্রচলন। তার থেকেই আবার চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সন্দেহবাদের উৎপত্তি।

প্রাচীন রোগবিভাগ পদ্ধতি অনুসারে progressive muscular Atrophy (পেশীতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান ক্ষয়)-কে একটি বংশানুক্রমিক ব্যাধি হিসাবে গণ্য করা হয়। সাধারণভাবে বলা চলে

এই ব্যাধি সহজাত নয়। কিছু দৌর্বল্য বোধ ও স্নায়ুতন্ত্রের অংশ বিশেষে ত্রুটি মাত্র বংশানুক্রমে লক্ষিত হয়, ঐ গুলিই কিন্তু আসলে রোগ নয়। দেহ ও মনের উপর অন্যান্য অতিরিক্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের প্রভাবে এই রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই ধীর অথচ ক্রমবর্ধমান ক্ষয় পেশীতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ পরিণাম ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা (metabolic disturbance) জনিত। সম্প্রতিকালে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ নির্ণীত হয়েছে। সেটি হচ্ছে জীবদেহে পরিণামক্রিয়া চালিয়ে যাবার ভারপ্রাপ্ত স্নায়ুতন্ত্রস্থ স্বয়ংক্রিয় কেন্দ্রের বিশৃঙ্খলা। দ্বান্দ্বিক তর্ক সূত্র অনুসারে আমাদের উচিত রোগের আসল কারণকে প্রভাবিত করা—স্নায়ুতন্ত্রস্থ স্বয়ংক্রিয় কেন্দ্রের বিশৃঙ্খল পরিচালনা শক্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। সেই সঙ্গে পেশীতন্ত্রের পুষ্টি সাধন ও দেহ যন্ত্রের শক্তি বর্ধন করে যাওয়া। এই রকম একটি চিকিৎসা বিধিই এই রোগের আধুনিক ও সুষ্ঠু চিকিৎসা বলে পরিগণিত হবে।

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে কি দেখতে পাই। বহু চিকিৎসক, বিশেষতঃ যারা তরুণ—কেবল অসুস্থ পেশীগুলিরই চিকিৎসা করেন এবং স্বভাবতই বিশেষ সাফল্যও লাভ করেন না। তাঁরা বুঝতেও পারেন না যে এতদ্বারা তারা শুধু চিকিৎসাবিধি প্রয়োগের ক্ষেত্রেই ভুল করছেন না, এ ক্ষেত্রে তাঁরা অঙ্গ সংস্থানবিদ্যা বিষয়ক (morphological) সংকীর্ণ বিচার পদ্ধতি অনুসরণ করে' দর্শনতত্ত্বগত ভুলও করছেন। এই পদ্ধতি ভির্কাও (virchow) প্রবর্তিত যান্ত্রিক কোষতত্ত্বের বিশেষত্ব। প্রাণীদেহের বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্পর্ক ও নির্ভরশীলতার বিষয় বিচার না করেই ভির্কাও (virchow) জীবদেহকে কেবল মাত্র কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন কোষের সমষ্টি হিসাবেই নিয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষা অনুসারে পেশী সমূহের ক্ষয় তাদেরই স্থানীয় প্রক্রিয়া মাত্র। চিকিৎসকের পক্ষে আজকের দিনেও এই ধরনের চিন্তাধারা কি ক্ষমার যোগ্য।

বহু সংক্রামক রোগের চিকিৎসা ক্ষেত্রেও এই রকম একপেশে দৃষ্টিভঙ্গী দেখা যায়। তার মধ্যে পরস্পরবিরোধী যুক্তিগুলি বুঝতে চেষ্টা করা যাক। সংক্রমণ শরীরে প্রবেশ করার পর শরীরের মধ্যেই কতকগুলি প্রতিরোধকারী সংক্রমণ-নাশক পদার্থ তৈরী হতে আরম্ভ করে, যার কাজ সংক্রমণের ক্ষতি সাধন করার শক্তি বিনষ্ট করা, তর্কশাস্ত্রের কথায় বলতে গেলে শরীরের মধ্যেই সংক্রমণের বিপরীত প্রক্রিয়ার উদ্ভব হয়। যাতে করে সংক্রমনকে বিনষ্ট করা যায়।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে কর্কট রোগ একটি কঠিন সমস্যা। এর চিকিৎসায় অস্ত্রোপচার ও রেডিয়াম প্রয়োগ বিধি প্রচলিত আছে। এ সব নিঃসন্দেহে এ যুগের চিকিৎসাবিদ্যায় মস্ত বড় অবদান। কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের পাভলভের সহকর্মী ডাঃ পেট্রোভাকৃত পরীক্ষা কার্যের ফলাফল বিবেচনা করতে হবে। স্নায়বিক স্বাস্থ্যভঙ্গ এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী অত্যধিক পরিশ্রম জীবদেহে পরীক্ষামূলক ভাবে কর্কট রোগ উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করে। এই সিদ্ধান্ত ডাঃ পেট্রোভা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমাদের ক্লিনিকেও এই ধরনের বহু দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। এই ভাবেই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছন গেছে যে, ত্রুটিযুক্ত স্নায়ুতন্ত্রের প্রতিরোধ ও পরিচালনা শক্তি হ্রাস পায়। আজ পর্যন্তও আমরা স্নায়ুতন্ত্রের অবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিই না। কর্কট রোগ উৎপত্তির পূর্বাবস্থায় যে সময়ে মারাত্মক ব্যাধির প্রতিরোধ করা সম্ভব, সেই সময়ে উচ্চতর স্নায়ুকেন্দ্রের কার্যাবলীকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা ও তাদের শক্তিবৃদ্ধি করার উপায়কেই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

প্রায় সমস্ত গবেষণার কাজই জীবকোষের অবক্ষয় প্রক্রিয়ার উপরই কেন্দ্রীভূত, কোষের বংশানুক্রম, জৈব রাসায়নিক ও ভৌতিক গুণাগুণ নির্ধারণের উপরই মনোনিবেশ করা হ'য়েছে এবং সেই সঙ্গে কোষের উপর বিভিন্ন ঔষধ ও তেজ বিকিরণের প্রভাবও দেখা হ'য়েছে কিন্তু আমরা যদি সাফল্যের সহিত কর্কট রোগের চিকিৎসা ও প্রতিরোধ করতে চাই তা'হলে আমাদের আরও কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বার করতে হ'বে। জীবদেহ কেন তার মধ্যে দুষ্ট কর্কটকোষগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে অপারগ হয়, কেনই বা তাদের অবাধ বৃদ্ধি হতে দেয় ? সাধারণতঃ আমরা জানি জীবদেহে সুস্থ স্নায়ুতন্ত্র প্রভাবাধীন সমস্ত কোষগুলি পরিণাম পরিবর্ধন ও প্রজনন ক্রিয়া সর্বদা যথাযথ সম্পাদন করে। এই সব প্রশ্নের উত্তরের জন্য দর্শন শাস্ত্রের নীতিগুলির যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে।

রোগশয্যা পার্শ্বে জীবনদর্শন তত্ত্ববিষয়ক সমস্যাগুলিকে এড়িয়ে যাওয়া, চিকিৎসা সংক্রান্ত 'লেখাজোকার' ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে দেখতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ পাঠ্য পুস্তকেই দার্শনিক সমস্যার অপেক্ষাকৃত বিশদ উল্লেখ শুধু উপক্রমণিকাতেই শেষ করা হয়, আসল বই শুধু বিষয় সমূহের বর্ণনা ও তথ্যগত উপাদানে ভর্তি থাকে, সাধারণ প্রাণীতত্ত্ব ও জীবনদর্শনতত্ত্বঘটিত সমস্যাগুলির মীমাংসা সেখানে থাকে না। অধুনা চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের দেশের অনেক মহৎ অবদান রয়েছে। এখন সেইগুলির অতিদ্রুত বিকাশ সাধন করতে হবে। মানব জাতির স্বাস্থ্য সংরক্ষণের সংগ্রামে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে অগ্রসর হতে হ'বে।

মার্কস্-লেনিন প্রবর্ত্তিত দৃষ্টিভঙ্গী "দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ", যা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ, আমাদের এই সংগ্রামের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার হবে।

সোমনাথ মুখার্জি অনূদিত

আমেরিকার স্কুলশিক্ষায় প্রয়োগবাদের ফলাফল

প্রমোদ সেনগুপ্ত

"মানব মনের" গত সংখ্যায় আমরা দেখিয়েছি আমেরিকার শিক্ষায় Henry James ও John Dewey-র নেতৃত্বে কি করে প্রয়োগবাদের (Pragmatism) উদ্ভব হল ও কিভাবে আমেরিকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে তা বিস্তার লাভ করল।

ডিউয়ী ও তাঁর অনুগামীদের মতে মানব সমাজে কোন শাশ্বত সত্য বা মূল্যমান নেই। তাঁদের মতে যা গ্রহণযোগ্য সত্য ও মূল্যমান তা স্থান, কাল, পাত্রভেদে কতকগুলি বিশিষ্ট সত্য ও মূল্যমান। মানব জাতির পুরো ইতিহাসটাই নাকি আমাদের এই শিক্ষা দেয়। মানবেতিহাসে যখন কোনো শাশ্বত সত্য নেই, মানব জীবনে যখন কোনো স্বাভাবিক বিধি নিয়ম নেই, মানুষের ব্যবহার সম্বন্ধেও আগে থাকতে এমন কোনো নিয়ম কানুন বেঁধে দেওয়া যায় না যার দ্বারা সব মানুষ একই ভাবে চালিত হবে। ইতিহাসে যা দেখা যায় তা হচ্ছে মানুষের ব্যবহারের কতকগুলি বিভিন্ন ছাঁচ। এই রকম যে কোনো একটা ছাঁচে ব্যক্তি যাতে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে তার জন্য চাই তার স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত উন্নয়ন।

আমেরিকার ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা বশতই যে এই প্রয়োগবাদী শিক্ষাদর্শনের আবির্ভাব হয়েছিল তা বলা বাহুল্য। লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, আমেরিকান বুর্জোয়া শাসক শ্রেণী তার প্রগতিশীল যুগে অন্যান্য দেশের মতই 'ক্লাসিকাল' বা 'লিবারাল' শিক্ষা দর্শনই মেনে চলত যার ভিত্তি ছিল শাশ্বত সত্য ও মূল্যবোধের উপর। এই দর্শনের জোরেই তারা একদিন স্বাধীনতা সংগ্রামে নেমেছিল এবং নিগ্রোদের স্বাধীনতার জন্য স্বজাতির বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হতেও কুণ্ঠিত হয় নি। সে যুগ ছিল ছোট ছোট স্বাধীন 'আঁত্রেপ্রেনর'দের (শিল্পপতি) যুগ। বুর্জোয়া সভ্যতা প্রথম থেকেই ব্যক্তি কেন্দ্রিক হলেও যতদিন পর্যন্ত তার সামন্ততান্ত্রিক-বিরোধী একটা বৈপ্লবিক ভূমিকা ছিল, ততদিন পর্যন্ত সে একটা উপযোগিতাবাদের (utilitarianism) দ্বারা ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সামঞ্জস্য বিধানে সচেষ্ট ছিল। মিল, স্পেন্সার, ডারউইন প্রভৃতি সকলেই বিশ্বাস করতেন ব্যক্তির উন্নতি হলেই সমাজের উন্নতি হবে। এই নীতিকে বলা হত Doctrine of enlightened self-interest।

কিন্তু বুর্জোয়া অর্থনীতির ক্রমবর্তনের ফলে বুর্জোয়া ব্যক্তিত্ব আলোকপ্রাপ্ত হতে না হতেই বিপরীত রূপ ধারণ করল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মত আমেরিকার সমাজবিন্যাসেও গভীর পরিবর্তন দেখা দেয়। ছোট ছোট শিল্পপতিদের গ্রাস করে বড় বড় শিল্পপতি ও একচেটিয়া মুনাফাভোগীরা আমেরিকার সাম্রাজ্যে একছত্র অধিকার বিস্তার করতে শুরু করল। তখন দেখা গেল যে পুরাতন শিক্ষা দর্শন ও তার সত্য ও মূল্যবোধের সমষ্টি এই শ্রেণীর অগ্রগতিতে বাধা

স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বভাবতই তখন তাদের ক্লাসিকাল শিক্ষাদর্শনের পরিবর্তে একটা নতুন শিক্ষাদর্শনের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। জেমস্ ডিউয়ী প্রয়োগবাদ নামে যে শিক্ষাদর্শনের প্রবর্তন করলেন তা হল আমেরিকার এক চেটিয়া ধনতান্ত্রিক সমাজের শিক্ষাদর্শন। এই শিক্ষাদর্শনের মূল কথা হল, শাশ্বত সত্য ও নীতিকেন্দ্রিক না হয়ে শিক্ষা হবে ব্যক্তি কেন্দ্রিক বা শিশু-কেন্দ্রিক। এখন থেকে শিক্ষায় জোর পড়বে সার্বজনিক নীতি ও বুদ্ধি বিকাশের উপর নয়, প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত গুণের বিকাশের উপর। একটি বিশিষ্ট সামাজিক ও ঐতিহাসিক পরিবেশে জন্মগ্রহণ করবার ফলে ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক বৃত্তিগুলি এক বিশেষ ধারায় বিকাশ লাভ করতে থাকে এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ নিজস্ব একটি জীবন গড়ে ওঠে। প্রয়োগবাদীদের মতে এই ভাবেই ব্যক্তির সমষ্টিগত চিন্তা ও মানসিকতা স্বয়ং সম্পূর্ণ একান্ত ব্যক্তিগত এবং রূপায়নেয়ও অধিকতর সার্থক ও সর্বাঙ্গীন হয়। জ্ঞানের জন্য জ্ঞানের আর কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই, এখন থেকে জ্ঞানের প্রয়োজন কেবল মাত্র ব্যক্তির জীবনকে সফল করার জন্য। এবং এই "সফলতার" অর্থ হয়ে দাঁড়াল পার্থিব ঐশ্বর্য আহরণ করা।

প্রয়োগবাদী শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রথম কথাই হচ্ছে যে প্রত্যেক শিশুর ক্ষমতা ইচ্ছা ও প্রবণতা অনুসারে তার পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করতে হবে, সকল শিশুর প্রতি প্রযোয্য এমন কোন নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম থাকা উচিত নয়। কোন শিশুর অঙ্কশাস্ত্র কিংবা ইতিহাস কিংবা সাহিত্য কিংবা পদার্থবিদ্যা ভাল নাও লাগতে পারে; কিন্তু দুনিয়াতে আরও অনেক জিনিস আছে যার মধ্যে কোনো না কোনোটা ভাল লাগে। তার এই ভাল লাগার বিষয়টাতেই তাকে উৎকর্ষ লাভের সুযোগ দিতে হবে, কেননা সেই বিষয়ের মধ্য দিয়েই সে তার ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলতে পারবে। কাজেই স্কুল শিক্ষায় বাধ্যতামূলক কোন বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা নেই। যদি কোনো শিশু মনে করে যে নৃত্যের মধ্য দিয়েই কিম্বা 'পোকার' খেলার মধ্য দিয়েই তার ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠবে তাহলে এই সব বিষয়গুলি চর্চা করার সুযোগ তাকে দিতে হবে ও স্কুলের পাঠ্যক্রমে এই সব বিষয়গুলিও থাকবে, এবং এই সব বিষয়ে পরীক্ষায় পাস করারও সুযোগ দিতে হবে। আজ আমেরিকায় বহু স্কুল দেখতে পাওয়া যায় যেখানে প্রকৃতি বিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র বিদেশী ভাষা, শেখান হয় না, তার পরিবর্তে অন্যান্য অনেক বিষয় পঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।[1]

এইরূপ শিক্ষা পদ্ধতির বিষময় ফল আজ আমেরিকার উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভোগ করতে হচ্ছে। বিশ্ববিখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ডিন তাঁর ১৯৫৫-৫৬ সালের রিপোর্টে অভিযোগ করেছিলেন যে, সে সব ছাত্র ঐ বিভাগে ভর্তির জন্য দরখাস্ত করেছিল তারা প্রায় কেউই স্কুলে সাহিত্য, অঙ্ক, দর্শন প্রকৃতি বিজ্ঞান ও বিদেশী ভাষা পড়ে নি—তার বদলে তারা পড়েছে Principles in Advertising Media, Office Management, Principels of Retailing, Stage and Costume design, Methods in Minor Sports, ইত্যাদি, ইত্যাদি। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ডিনও তাঁর ১৯৫৫ সালের রিপোর্টে বললেন "We have. found that few of our entering students, however carefully selected, possess these skills (in reading and writing) to the extent needed for law studies."

---

[1] হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিস্ট্রির অধ্যাপক Dr. Conant বলেছেন : "For example, only 12,000 of the 21,000 senior high schools offer a course in physics. It seems like hopeless a task to find another 9000 high school physics teacher. আর যে সব স্কুলে ফিজিক্স পড়ান হয় তার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই "not taught by adequately trained teachers." (The child, the parent and the state, 1959, p 38).

বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে বহুল পরিমাণে বিজ্ঞান-ছাত্রের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে ; কিন্তু এই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই আমেরিকা তার প্রয়োজন মেটাতে পারছে না এবং ক্রমশই পিছনে পড়ে যাচ্ছে। ১৯৫৫ সালে Admiral Lewis L Strauss তাঁর একটা রিপোর্টে বলেছিলেন যে আমেরিকার শতকরা ৫৩টি স্কুলে জিওমেট্রি শেখান হয় না। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ডিন Dr. John Dunning-এর মতে "no high school any where in our country has even one half of the Russian requirements in mathematics, sciences, physics and chemistry."

আমেরিকায় বাধ্যতামূলক শিক্ষা হচ্ছে ৭ বছর থেকে ১৬ বছর পর্য্যন্ত, কিন্তু এই নিয়ম সব রাষ্ট্রগুলি সমানভাবে মেনে চলে না। অনেকগুলি রাষ্ট্রে ঐ বয়সের শতকরা মাত্র ৭৫ জন স্কুলে যায়। অসংখ্য শিশু প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পূর্বেই স্কুল ছেড়ে দেয়, অনেকে অর্থনৈতিক কারণে, আর অনেকে 'বুদ্ধির অভাবে'। বহু সংখ্যক ছাত্র প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য স্কুল যায় না। ১৯৫৩-৫৪ সালের হিসাবে দেখা যায় যে ২ কোটি ৭০ লক্ষ প্রাথমিক ছাত্রের মধ্যে মাত্র ৭০ লক্ষ অর্থাৎ এক চতুর্থাংশ, মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ভর্তি হয়েছিল।

১৯৪৮ সালে বেঞ্জামিন ফাইন আমেরিকার শিক্ষা সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করে New York Times পত্রিকায় কতকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন ; ঐ সালেই প্রবন্ধগুলি "Our children are cheated" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলে খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। তাতে ফাইন দেখিয়েছিলেন যে আমেরিকাতে ছাত্র সংখ্যার তুলনায় স্কুল ও স্কুল ঘরের সংখ্যা অত্যধিক কম, শিক্ষার মান অত্যন্ত নিম্ন, শিক্ষকদের বেতন খুব স্বল্প, স্কুলে ডিসিপ্লিনের খুবই অভাব, শিক্ষকরা কিছুকালের মধ্যেই অন্য চাকুরীতে চলে যাচ্ছেন, কিন্তু সেই পরিমাণে নতুন শিক্ষক আসছেন না। তার উপর আবার "বৈজ্ঞানিক" নামে যে সমস্ত শিক্ষা পদ্ধতি চালান হচ্ছে তাতে আমেরিকার শিক্ষা সংকটকে আরও ঘনীভূত করে তুলেছে।

আমেরিকার শিশুশিক্ষা বিষয়ে Rudolf Flesch-এর Why Johnny Can't Read (1955) একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বই। তাতে তিনি দেখিয়েছেন যে, আমেরিকার শিশুদের স্কুলে শিক্ষা বর্ণমালা ও ধ্বনিতত্ত্ব (phonetics) দিয়ে শুরু হয় না। প্রত্যেকটি বর্ণ ও তার উচ্চারণ পদ্ধতি শেখানো— যা প্রত্যেক সভ্য দেশে প্রাচীন কাল থেকে বৈজ্ঞানিক ও সর্ববাদী পন্থা বলে স্বীকৃত হয়ে এসেছে, তা আজ আমেরিকার নব্য প্রয়োগবাদী ও ফ্রয়েডবাদী মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষকদের দ্বারা বর্জিত।[২] আমেরিকান

---

[২] Prof. Dr. Lee J. Cornback, University of Illinois বলেন : It once seemed completely obvious...that you have to read words before you can read sentences, and that the way to learn to read words is to learn letters first. No one questioned this......until the reading process was studied in the psychological laboratories. The psychologists......found that good readers do not actually notice the letters or syllables that make up a word. The good reader takes in a whole word or phrase at a single glance, recognising it by its outline. Now we teach pupils to recognize short words as units from the very beginning. Sentences and short stories are introduced as soon as the pupil knows just a few words." (Educational Psychology. 1954).

মনস্তাত্ত্বিক 'বৈজ্ঞানিকরা' অনেক গবেষণা করে আবিষ্কার করেছেন যে, বর্ণমালা শেখানোর পরিবর্তে শিশুদের গোটা শব্দ শেখানো আরও বৈজ্ঞানিক, এবং এই পন্থাকে তাঁরা বলেন, word-method. "One word after another after another after another. ……The child is told what each word means and then they are mechanically, brutally hammered into his brain." (P.5.)

অসংখ্য মোটা মোটা পুস্তক এই word-method-এর উপর লেখা হয়েছে—"absolutely fantastic books, which fly in the face of all logic and commonsense।" এসব বই কারা লিখেছেন? সাধারণ শিক্ষকরা নন! বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় অধ্যাপকরা,—শিক্ষার অধ্যাপক, মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক।[৩]

Word-method-এর ফল হয়েছে এই যে কয়েক বৎসর স্কুলে কাটাবার পর বহুসংখ্যক ছাত্র ভালভাবে পড়তেও পারে না, ঠিকভাবে লিখতেও পারে না—তারপর তাদের "সংশোধনী" ক্লাসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। "সংশোধনী ক্লাস"—এরকম একটা অদ্ভুত কথা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া কি কেউ কোথাও শুনেছে? —রুডল্ফ ফ্লেস প্রশ্ন করছেন, আপনারা কি জানেন যে ১৯২৫ সালে আমেরিকা এই word-method পন্থা অবলম্বন করার পূর্বে পড়তে শেখাটা পৃথিবীর কোথাও একটা সমস্যা বলেই গণ্য হত না?

কেবলমাত্র স্কুল কর্তপক্ষই যে বর্ণমালা ও উচ্চারণ পদ্ধতি শেখার বিরোধী ও word-method-এর পক্ষপাতী তাই নয়, বিভিন্ন রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষদেরও এই একই মত।[৪]

এই শব্দ পদ্ধতি শিক্ষার ফল আমেরিকাতে কি হয়েছে? ফ্লেস বলেন: "Look into any college handbook of English and you will find a long list of common spelling errors college students are apt to make. Here are some current campus favourites: definate (for definite), differnt (different), docter (doctor), grammer (grammar), libery (library), medecine (medicine), professer (professor). etc etc" (p.40)

এই সম্বন্ধে Dr. Robert A. Hall, Associate Professor of Linguistics, Cornell University, বলেন: "পড়া ও বানান শেখার এই নিষ্ফল পন্থার ফলে শিশুদের স্কুল জীবনের বহু সময় নষ্ট করা হচ্ছে।……এর ফল হয়েছে এই যে, যে বয়সে ছাত্ররা Arabian Nights, Andersen's

---

৩। এই প্রসঙ্গে বিশ্ববিখ্যাত ও সর্ববাদীসম্মত আমেরিকার শ্রেষ্ঠ ভাষাতাত্ত্বিক Prof. Leonard Bloomfield বহুপূর্বে তাঁর Language (1933) বইতে লিখেছিলেন: "Our schools are utterly benighted in linguistic matters. ……Nothing could be more discouraging than to read our 'educationists,' treatises on methods of teaching children to read."

৪। Newyork State Manual-এ বলা হয়েছে—"Phonetic analysis is not a very effective way to teach the spelling of words."

Fairy Tales, Mark Twain, Louisa May Alcott, Robert Louis Stevenson, Edgar Allan Poe Charles Dickens, Conan Doyle পড়তে পারত ও উপভোগ করতে পারত, তা বেশীর ভাগ ছাত্রই আর পারছে না।"

এই শিক্ষা পদ্ধতির আর একটি বিষময় ফল হচ্ছে এই যে, এ পদ্ধতি হচ্ছে গণতন্ত্র-বিরোধী। আজ আমেরিকার অনেক শিক্ষাবিদ বুঝতে পারছেন যে কেবলমাত্র যে সব স্বচ্ছল পরিবারে শিক্ষার আবহাওয়া আছে ও যে-সব পরিবার বাড়িতেও শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে তারাই উচ্চ শিক্ষার দিকে অগ্রসর হতে পারছে কিন্তু বাদ বাকি পরিবারে দেখা যায় এবং এদের সংখ্যাই বহু পরিমাণে বেশী যে, তাদের সন্তান সন্ততিরা তিন বৎসর ধরে বিনা সাহায্যে ও বিনা উপদেশে ১২০০ শব্দের সঙ্গে লড়াই করে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। কিছু কাল পরে লেখাপড়ার প্রতি আকর্ষণ তাদের সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্তও আমেরিকান পিতা মাতারা মনে করতেন যে, তাঁদের সন্তানরা তাঁদের চাইতে বেশী শিক্ষা পাচ্ছে এবং ন্যায়সঙ্গত ভাবেই এতে তাঁরা গর্ব অনুভব করতেন। কিন্তু গত বিশ ত্রিশ বৎসরে অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। ফ্লেস বলেন ঃ

"For the first time in history American parents see their children getting less education than they got themselves. Their sons and daughters come home from school and they cannot spell simple words like February and Wednesday; they don't know the difference between Austria and Australia. The fathers and mothers don't know the reason for this, but they know that something terrible has happened to their most precious dreams and aspirations, that something, somewhere is very, very, wrong. (pp, 132-33),

যখন Why Johnny Can't Read প্রকাশিত হয় তখন ডিউয়ী-পন্থী শিক্ষকরা তার প্রকাশক হারপার কোম্পানীর পাঠ্য পুস্তকগুলি বয়কট করবেন বলে ভয় দেখিয়েছিলেন। এই ধরনের আর একটি উদাহরণ ঃ পূর্বোল্লিখিত ভাষাবিদ অধ্যাপক ডাঃ ব্লুমফিল্ড ১৯৪৯ সালে যখন বর্ণমালা-ধনিতত্ত্ব ভিত্তিক শিশুদের উপযোগী একটি পাঠ্যপুস্তক রচনা করে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেন তখন কোনো প্রকাশকই এই বই ছাপতে রাজী হয় নি, এই কারণে যে, কোনো শিক্ষকই স্কুলে এই বই পড়বেন না। মুক্ত আমেরিকায় রাজনৈতিক প্রশ্ন ছাড়াও অন্যান্য ব্যাপারে মানুষের স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করার স্বাধীনতা বাস্তব ক্ষেত্রে কতটুকু—তা এই রকম অসংখ্য তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা থেকেই বোঝা যায়।

আমেরিকার চিন্তাশীল শিক্ষাবিদরা এখন অভিযোগ করতে শুরু করেছেন যে, আমেরিকার স্কুল ও কলেজগুলি থেকে যে সব তত্ত্বমূলক 'কেতাবী' বিষয়গুলি মানুষের মন ও নৈতিক চরিত্র গঠন করে সেগুলিকে বিতাড়িত করা হচ্ছে[৫]। পাঠ্যক্রমে Dating, Ball Dancing, Typing, Methods

---

(৫) অন্যান্যধনতান্ত্রিক দেশের মত আমেরিকাতেও কতকগুলি ব্যয়সাধ্য উৎকৃষ্ট স্কুল আছে যেখানে কেবলমাত্র ধনী ব্যক্তিরাই তাদের সন্তানদের ভাল শিক্ষার জন্য পাঠাতে পারে। এই সব স্কুলের মান সাধারণ স্কুলগুলি থেকে স্বভাবতই অনেক উচ্চে।

in Minor Sports, Driving, Dress Designing ইত্যাদি বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে ও এই সব বিষয় নিয়ে পরীক্ষা পাস করার সুযোগ দিয়ে আজ আমেরিকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি মানসিক অলসতাকে প্রাধান্য দিচ্ছে এবং প্রচুর সংখ্যক মানসিক পঙ্গু-ব্যক্তি সৃষ্টি করছে[৬]। আর যে সব ক্ষেত্রে তত্ত্বমূলক বিষয় পড়াবার ব্যবস্থা করা হয়, সেগুলি এমনভাবে বিকৃত করে পড়ান হয় যে তার দ্বারা বিষয়বস্তুর সঠিক জ্ঞান ও বিদ্যা অর্জন করার সুযোগ ছাত্রদের দেওয়া হয় না। আমেরিকার বিখ্যাত শিক্ষাবিদ Prof. Barzun-এর মতে : "The mind slitters with the subjects which it is anti-educational to call by their right names ; not astronomy, geology, and physics, but 'Earth Science' ; not English and French, or reading and writing, or speaking and reciting, but 'Language Arts', not history and civics and economics but 'Social Studies'; not sociology and anthropology but 'Human Relations' ; it is the positive call for vagueness and trifling[৭] .

আমেরিকার নেতারা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে বেড়ান আমেরিকার মত অঢেল শিক্ষা ব্যবস্থা আর কোনো দেশে নেই। বস্তুত আমেরিকায় চারদিকে শিক্ষার হুড়াহুড়ি— ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, পশ্চাতে সর্বত্র ; সারা জীবন ভরেই শিক্ষা! কেনই বা হবে না? শিক্ষাটাতো ওখানে একটা adventure আর সহজলভ্য[৮]। (অবশ্য যদি টাকা থাকে) খুব পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না এবং মস্তিষ্ক প্রয়োগেরও খুব বেশী দরকার করে না। সেখানে শিক্ষার জন্য সকলেই আত্মনিয়োগ করেন— রকফেলার, কার্নেগী, ফোর্ড, তেল কম্পানী, মোটর কোম্পানী, একচেটিয়া সব ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, —সকলেই শিক্ষাব্রতী! এবং শিক্ষাটা যে কি বস্তু সে সম্বন্ধে Dr. William H. Kilpatrick, Professor Emeritus of Education in Teachers' College, যিনি শিক্ষার উপর অনেকগুলি মোটা মোটা বই লিখেছেন ও যিনি প্রয়োগবাদী শিক্ষকদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেন, কোনো

---

(৬) Prof. Harold Laski ১৯৩৫ সালে বলেছিলেন : "The harm done to education by Dewey and his followers in telling teachers that the child ought to study the thing it finds pleasant which has the result of making effort sceem an evil on the ground that it is unpleasant. In the result the student fail's to learn the need that organised concentration of mind which gives understanding because as soon as it is difficult it becomes unpleasant." (Holmes—Laski Letters, II, p. 1385)

(৭) Jacques Barzun, "The House of Intellect", 1959, p. 113

(৮) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে হাই স্কুলের ছাত্র সংখ্যা আমেরিকায় অনেক বেড়ে গিয়েছে এবং শিক্ষাও big business-এর অন্তর্গত হয়েছে। Prof. Woodring বলেন : "High schools try in a hundred ways to keep the students interested : easier courses, more 'practical' courses, more varied offerings, individual guidance, dances, parties and other social activities including extensive athletic programs and allowing high school credit for everything from social dancing to camping and fishing". (A Fourth of a Nation, p. 2)

প্রকার গাম্ভীর্যের হানি না করেই বলেছেন : “I learn what I live, and I learn it as I accept it. ... I learn it in the degree that I live it... : And I learn what I live. What is learned is the inner object of the verb to live. We learn this content as we accept consciously to live it.”[৯]

আমেরিকাতে আজ তা'ই দাঁড়িয়েছে—সবই জীবন, সবই শিক্ষা। সেক্স হল জীবনের মধ্যমণি, (ডেটিং, ড্রাইভিং, পোকার, প্লেইং) হল জীবনের অলঙ্কার, আর-এ সবই শিক্ষা! শুধুমাত্র অঙ্কশাস্ত্র, প্রকৃতি বিজ্ঞান, বিদেশী ভাষা—এগুলিই অনেক ক্ষেত্রে জীবন নয়! তাই যে-কোনো আমেরিকার সাধারণ লাইব্রেরীতে “শিক্ষা” শ্রেণীতে Education of Henry Adams-এর মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বই-এর পাশেই দেখা যায় Education of a Poker Player (by Herbert Yardley) ! শিক্ষা ও জীবন নিয়ে এত যে কথার মারপ্যাঁচ ও ভেল্কি বাজি তার প্রধান কারণ হল শিক্ষা ও তার ব্যক্তিগত ও জাতীয় উদ্দেশ্যের সংজ্ঞার অভাব। অধ্যাপক বারজুন এবং আরও অনেক শিক্ষাবিদের মতে —“We have lost, or perhaps never formed, any consumicable idea of the purpose of schools. ......Indeed, whatever is wrong is the fault of our schools, for is it not there that we learn to become what we are ? This common indictment overlooks but one point, which is that the schools are run by adults—and run to suit other adults in political, intellectual or business life. The schools are thus fully the product of our politics business, and public opinion as these are the products of our schools. It is because the link is so close that the schools are so heard to change.” (p. 88)

আমেরিকার হাইস্কুলগুলিতে একটি পাঠ্যক্রম নয়, অনেকগুলি পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা হয়, যেমন কলেজ প্রস্তুতি, ব্যবসায়ী, কারিগরী, জীবন সুবিন্যাস (life adjustment) ইত্যাদি। আমেরিকার স্কুলে খুব কম বিষয়ই আছে যা সব ছাত্রের পক্ষেই বাধ্যতামূলক। কোনো কোনো শ্রেষ্ঠ হাই স্কুলে তিন বৎসর ইংরাজী এবং এক বৎসর আমেরিকার ইতিহাস বাধ্যতামূলক ; কোনো কোনো স্কুলে ১ বৎসর অঙ্কশাস্ত্র, ১ বৎসর বিজ্ঞান অথবা সামাজিক বিষয় (social studies) বাধ্যতামূলক ; বাদবাকি বিষয়গুলি ছাত্ররা অনেকগুলি বিষয়ের মধ্যে বেছে নিতে পারে। তাছাড়া আমেরিকায় পরীক্ষা ব্যবস্থাও এমন যে পরীক্ষায় পাস করা খুবই সহজ। ফেল করা ছাত্রের সংখ্যা খুবই কম।

আমেরিকার নেতারা গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করেন যে, তাঁদের দেশে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্র সংখ্যা অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশী, কিন্তু তাঁরা একটা কথা চেপে যান যে গুণগত দিকটাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে তাঁরা এই সংখ্যাধিক্য অর্জন করেছেন। পূর্বের তুলনায় এবং অন্যান্য দেশের তুলনায় আমেরিকার স্কুল কলেজগুলি আজ কম সংখ্যক তত্ত্বান্বেষী ছাত্রের সন্ধান মিলবে,

---

(৯) “How should Teachers be Educated ?” in Education Forum, March, 1956.

অধিকাংশ ছাত্রদের মানসিক আগ্রহ ও প্রচেষ্টা কম, এবং অধিকাংশ ছাত্রদের পরিবারে সাংস্কৃতিক আবহাওয়ার মান খুবই নীচু অধিকাংশ ছাত্রই উচ্চাকাঙ্খাহীন এবং শৃঙ্খলা বিহীন।

অনেক অভিজ্ঞ শিক্ষকের মতে আমেরিকার ছাত্ররা “differ more widely than those of other countries in their school achievements. Children are promoted on a basis of lower minimum of subject-matter mastery. There is also much less home and social pressure put upon children to learn school materials. Heterogenity in this respect has increased with the growing tendency to promote every youngster a grade each year. Children are found in the sixth grade, for example; with fourth grade and some with eighth gradc ability in arithmatic and in the fifth grade with second grade and with eighth grade reading ability. A considerable number of college students cannot read as well as the best readers just leaving junior high school. These conditions have become aggravated in recent years.”[১০]

আমেরিকার শিক্ষা আজ অনেকগুলি কঠিন সমস্যায় জর্জরিত এবং তার কোনটিরই সমাধানের পথ আমেরিকান নেতারা খুঁজে পাচ্ছেন না—শিক্ষকদের বেতন স্বল্প, ছাত্রদের শিক্ষাব্যয় অত্যধিক ও ক্রমবর্ধমান, ছাত্রদের ক্রমবর্ধমান উচ্ছৃঙ্খলতা ও তাদের অপরাধের সংখ্যা (juvenile delinquency) বৃদ্ধি, শিক্ষকের অভাব, বিশেষ করে বিজ্ঞান ও অঙ্কের শিক্ষক, শিক্ষকদের অনুপযুক্ততা, স্কুলগৃহের অভাব, শিক্ষকদের প্রতি দেশদ্রোহিতার সন্দেহ, নিগ্রোশিক্ষা ও জাতিভেদ, নিম্ন মানের শিক্ষা, বিজ্ঞান, ছাত্র ও শিক্ষকের অভাব, ইত্যাদি।

বর্তমানে আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থা কি অবস্থায় এসে পৌঁছেছে সে সম্বন্ধে Dr. Louis Dublin সংক্ষিপ্তাকারে বলেছেন: “The nation’s educational house is on fire. If the blaze is not put out, and quickly, it may spread in time to the structure, and may deal a stunning blow to national morale and morals. ...Buildings are too few and over crowding is the rule rather than the exception. ...Text books, school furniture and other equipments are lacking. And worst of all, teachers are quitting in wholesale lots. ...These are what responsible authorities say will be the end results if nothing is done about current conditions.

One : Delinquency will rise. Robbery, prostitution, any crime that does not require brains will flourish and grow.

Two : The sum of national knowledge will fall, because the children are not getting a proper education,

---

(১০) Grieder and Romine—Amricane Public Education, New York, 1955, pp 116-17

Three ; The schools will turn out inept, downright incompetent youths. Business and industry will have to absorb these incompetents for lack of better. There will not be enough brains to go round the top jobs. Then down the ladder will go the high standards of American business and industry. How about the Government ?’’[১১]

আজ আমেরিকায় ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে সর্বক্ষেত্রে যে গভীর সংকট দেখা দিয়েছে, শিক্ষা-সংকট তারই একটা দিক মাত্র। এই সব সংকট থেকে মুক্তি পাবার কোনো পথই আমেরিকার কর্ণধাররা বার করতে পারছেন না। ফলে সংকট ক্রমশঃ গভীরতর হয়েই চলেছে। শিক্ষা ক্ষেত্রেও এই সংকট। সর্ব নিম্নস্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই আজ দেখা যাচ্ছে যে আমেরিকায় প্রয়োজন মত বৈজ্ঞানিক তৈরী হচ্ছে না, সেখানে জার্মানী ও অন্যান্য দেশ থেকে বৈজ্ঞানিক আমদানী করতে হচ্ছে। চিকিৎসকদের ক্ষেত্রেও তাই। বহু সংখ্যক বিদেশী চিকিৎসক চাঁকরী নিয়ে আমেরিকাতে যাচ্ছেন। ইঞ্জিনিয়ারীং-এও এই একই অবস্থা।

আমেরিকার এই শিক্ষা সংকটকে আরও গভীরতর করে তুলেছে সমাজতান্ত্রিক্ষ দেশগুলির প্রতিযোগিতা। পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্বেও, আমেরিকা জগতে কারিগরি শিক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করে ছিল। ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৫৭ সালে যখন sputnik পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে শুরু করল, আমেরিকা হঠাৎ দেখতে পেল যে দুনিয়ায় সব ওলট পালট হয়ে গিয়েছে। বিজ্ঞানের বহু বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন আমেরিকাকে পশ্চাতে ফেলে বহুদূর অগ্রসর হয়ে গিয়েছে—চীন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিও নাকি দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। এইরূপ বৈপ্লবিক ঘটনা নিশ্চয়ই বিনা কারণে ঘটেনি। পরবর্তী প্রবন্ধে সেই সব প্রশ্নই আলোচিত হবে।

---

(১১) Wisconsin State Journal, Feb. 18, 1958.

নতুন বই*

জ্যোতির্ময় শর্মা

বিজ্ঞানের জ্ঞান ও বিজ্ঞানানুগ দৃষ্টিভংগী এক জিনিষ নয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্র বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় জ্ঞানর্জ্জন করে বেরিয়ে আসছে প্রতি বছর। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ভাল একটা চাকুরী বা ভবিষ্যতে প্রচুর রোজগারের আশায় অথবা সমাজে ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য বিজ্ঞান পড়ে তারা। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করার জন্য বিজ্ঞান পড়ে মুষ্টিমেয় কয়জন। তাই বিজ্ঞান পড়ে বটে কিন্তু প্রকৃত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী গড়ে ওঠে না। জীবন ও জগত সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান ও চিন্তাধারা সংকীর্ণ ও একপেশে থেকে যায়। প্রাকৃতিক ও সামাজিক সমস্ত ঘটনা ও পরিবর্ত্তনকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন দিয়ে বিশ্লেষণ করতে না পারার দরুণ সেগুলো তাদের কাছে দুর্ব্বোধ্য ও ধোঁয়াটে মনে হয়। তাই নিয়ন্ত্রক, স্রষ্টা, অদৃশ্য দৈবশক্তি, অদৃষ্ট, ইহকাল-পরকাল প্রভৃতি টেনে আনতে হয় এসব ঘটনাগুলোর ব্যাখ্যার জন্য।

আদিম অবৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণাই ক্রমশঃ মার্জিতাকারে ভাববাদী দর্শনের রূপ নিয়েছে। এই দর্শন বা দৃষ্টিভংগী দিয়ে প্রকৃতি বর্হিভূত কোন কিছু না টেনে এনে কোন ঘটনার কার্যকারণের সঠিক নির্ণয় সম্ভব হয় না। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী ছাড়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, জীব-জীবাণু, মানবমস্তিস্ক, মানব-মন প্রভৃতি জটিল পদার্থের ক্রমবিকাশের ইতিহাস অথবা রাষ্ট্রবিপ্লব, বিশ্বযুদ্ধ বা শ্রেণী সংগ্রাম ইত্যাদির মত ঘটনার সুক্ষ্ম কারণ বিশ্লেষণ অসম্ভব।

প্রতিটি ঘটনা, তা সামাজিকই হোক আর প্রাকৃতিকই হোক, কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম-কানুন দ্বারা সর্ব্বদা পরিচালিত হয়। সেই ঘটনাগুলোকে বুঝতে হলে এই সব নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার। এই জ্ঞানই হচ্ছে বিজ্ঞান। এই জ্ঞান দিয়ে সমস্ত ঘটনাকে (প্রাকৃতিক ও সামাজিক দেখা, বিচার করাই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী। রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর, জগদানন্দের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত বাংলায় জটিল বৈজ্ঞানিক তত্ব পরিবেশনের চেষ্টা চলে আসলেও বিজ্ঞানের নানাদিক সম্পর্কে সহজবোধ্য বাংলা বই-এর যে প্রাচুর্য নেই—এ সত্য অনস্বীকার্য।

পাঠকদের মনে জীব ও জগত সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ধারণা জন্মিয়ে দেওয়ার জন্য লেখক এ পুস্তকে বিজ্ঞানের নানা শাখা প্রশাখা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা

---

* দেহ-প্রাণ-মন—অসিত সেন, ইনষ্টিটিউট অফ সাইন্টিফিক থট্‌স্‌, ২৩ ল্যান্সডাউন প্লেস, কলিকাতা-২৯ : দাম দুই টাকা।

প্রশাখার পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং উচ্চতর প্রাণীর বিকাশ ও বিবর্তন সম্পর্কে গোড়ার কথাগুলো সহজ করে বলার চেষ্টা করেছেন।

সৃষ্টি রহস্য বুঝতে গেলে পদার্থ ও তার সৃজনী শক্তি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা দরকার। সামান্য সংখ্যক মৌলিক জড়পদার্থের অবস্থায়, বিভিন্ন মাত্রায় ও অনুপাতে সন্নিবেশের ফলে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি। পদার্থের অণুসমূহের অন্তর্নিহিত নিজস্ব গতিশক্তি ও পারস্পরিক আকর্ষণী শক্তির জোরে বিভিন্ন জাতীয় অণু রাসায়নিক ভাবে সংযুক্ত হয়ে নতুন পদার্থ সৃষ্টি করছে।

এই মূল গতিশক্তি আছে বলেই এক জাতীয় পরমাণু অপর জাতীয় পরমাণুর সাথে মিশে নতুন বস্তুকণা সৃষ্টি সম্ভব করে তোলে। পদার্থই জটিল ও বিচিত্র সংগঠনের মধ্য দিয়ে পরিবেশের প্রভাবে রূপান্তরিত হতে হতে প্রথমে সরল যৌগিক পরে হাইড্র-কার্ব্বনের ন্যায় উচ্চ স্তরের জটিল যৌগিক পদার্থ; হাইড্রকার্ব্বন থেকে অ্যামাইনো অ্যাসিড ও প্রোটিন এবং পরে প্রোটিন কণার বিচিত্র সংযোগের ফলে প্রাণের উৎপত্তি।

মানুষ আজ এই প্রোটিন কণা ও প্রটোপ্লাজম-এর রহস্য ভেদ করতে বদ্ধপরিকর। সে আজ প্রোটিন অণুর জীবন ইতিহাস সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানলাভ করতে উদগ্রীব।

রসায়ণ শাস্ত্র জৈবই হোক আর অজৈবই হোক বস্তুকণার পরিমাণগত পরিবর্ত্তন কি ভাবে গুণগত পরিবর্ত্তন ঘটায় তারই এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। পদার্থের গঠন, গতি, রূপ ও গুণগত পরিবর্ত্তনের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে কিছু কিছু হদিশ দেওয়ার জন্য লেখক বস্তুকণার গঠন প্রণালী সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রসায়ণ শাস্ত্র ও পদার্থ বিদ্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন কয়েক অধ্যায়ে ও সেটা মোটেই অবান্তর হয়নি। বরং রসায়ণ ও পদার্থ বিদ্যায় স্বল্পজ্ঞান সম্পন্ন পাঠকদের পদার্থতত্ব ও সৃষ্টিতত্ব সম্বন্ধে বুঝতে অনেক সাহায্য করবে এই অধ্যায়গুলো।

কি করে অ্যামাইনো এ্যাসিড থেকে প্রোটিন কণার সৃষ্টি হলো এবং কি করে এই প্রোটিন অণু পরিবেশের প্রভাবে ও অন্যান্য জৈব ও অজৈব রাসায়ণিক পদার্থের সংযোগে প্রোটোপ্লাজম্ ও জীব-কোষে পরিণত হলো, কি করে আদিম এক কোষ বিশিষ্ট জীব (অ্যামিবা প্রভৃতি) লক্ষ লক্ষ বছর ধরে পরিবেশের প্রভাবে নানারকম ঘাত প্রতিঘাতকে উপেক্ষা করে বিবর্তিত হতে হতে উন্নততর জীব মানব শক্তিতে পরিণত হলো,—সে ইতিহাস যেমন বিচিত্র তেমনি হৃদয়গ্রাহী।

অফুরন্ত জ্ঞানভাণ্ডারের অধিকারী আজকের যে মানুষ নিজের বুদ্ধিবলে ও চেষ্টায় আকাশ পাতাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জয় করতে চলেছে সেও সেই মুষ্টিমেয় অজৈব মৌলিক পদার্থের লক্ষ লক্ষ বছরের রূপান্তরনের ফলেই সম্ভব হয়েছে। পদার্থকে বাদ দিয়ে জীবনের অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না। সে জৈবই হোক আর অজৈবই হোক, এক কোষী অ্যামিবাই হোক আর বহুকোষী প্রাণীই হোক; সকলের মূলে পদার্থকণা।

প্রাণোৎপত্তির রহস্য উদঘাটন করতে গিয়ে লক্ষ লক্ষ বৎসর ব্যাপী বস্তুকণা যে বিচিত্র সংগঠনের মধ্যদিয়ে বিকশিত হয়ে চলেছে সেই ইতিহাসের আলোচনা অনিবার্যভাবে আসবেই। যে

প্রাণীদেহ জটিল প্রোটিন অণুদ্বারা গঠিত সেই প্রোটিন অণুর জন্মকথা, প্রোটিন ও প্রাণের সম্পর্কে, পদার্থ থেকে প্রাণ সৃষ্টির রহস্য যতদূর সম্ভব সহজ ভাবে বলতে চেষ্টা করেছেন লেখক।

পৃথিবীর বাহিরে প্রাণী আছে কিনা, সে বিষয়ে পৃথিবীর নানা দেশের বিজ্ঞানীদের, মতামত বিশেষ করে সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের এ বিষয়ে গবেষণায় অগ্রগতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন—'পৃথিবীর বাহিরে প্রাণ'—এই অধ্যায়ে। লেখক মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী। এই দর্শন পদার্থের অন্তর্নিহিত গতিশীলতা ছাড়া আর কিছুকেই শাশ্বত বলে মনে করে না। এই চিরন্তন গতি-শীলতাই পদার্থের রূপ পরিবর্ত্তনে সাহায্য করে নূতন গুণ সৃষ্টি করে।

সৃষ্টি রহস্যের পুরনো আধ্যাত্মিক ও অবৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা ল্যামার্ক, ডারউইন প্রভৃতি জীব বিজ্ঞানীদের মতবাদ দ্বারা খণ্ডিত হয়েছে। বানর জাতীয় চতুস্পদ জীব কি করে মেরুদণ্ড সোজা মানবদেহী হয়ে উঠল, আবার কি করে ধীরে ধীরে মানুষ কথা বলতে শিখল, ভাবের আদান প্রদান করতে লাগল লেখক এই বইএ 'পদার্থ ও মানুষ' এই অধ্যায়ে বিবৃত করেছেন। এই ভাষাই ক্রমশঃ মানব মস্তিষ্কে নানারূপ সূক্ষ্ম ও জটিল পরিবর্তন নিয়ে এলো। মানুষ এইভাবে নিম্নশ্রেণীর জীব থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে পড়ল।

মন ও চেতনার রহস্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখক স্নায়ুতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন। মন কি? কোথায় তার উৎস? লেখক এ বিষয়েও আলোচনা করেছেন। বর্হিজগত ও সামাজিক পরিবেশ মানুষের মন ও চেতনাকে কি ভাবে প্রভাবান্বিত করে তাও তিনি পরিস্কার ভাবে দেখিয়েছেন।

সর্বশেষে লেখক পাভলভের 'কনডিশনড রিফ্লেক্স' নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং খুব সহজভাবে শারীরতত্ত্বের এই জটিল প্রক্রিয়া নানা উদাহরণের মাধ্যমে পাঠকদের বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। মস্তিষ্কই হল পদার্থের উচ্চতম সংগঠন এবং চিন্তা হচ্ছে এই মস্তিষ্কেরই ক্রিয়াকলাপ। তাই পদার্থ থেকে চিন্তা প্রক্রিয়াকে আলাদা করে দেখা অসম্ভব।

অতি অল্প কয়েকটি অধ্যায়ে অনেকগুলি বিষয়ের অবতারণা করে কয়েক জায়গায় লেখক অস্পষ্ট হয়ে পড়েছেন ও জায়গায় জায়গায় সামঞ্জস্য রাখতে পারেন নি। তবুও সৃষ্টি রহস্য মন, চেতনা প্রভৃতি জটিল প্রশ্ন সম্পর্কে জ্ঞানার্জ্জনে আগ্রহশীল পাঠক এই বই থেকে প্রাথমিক জ্ঞানলাভ করবেন বিশ্বাস করি।. বিশেষ করে ইংরেজী না জানা পাঠকের কাছে বইটি সমাদর পাবে। বইয়ের ছাপা ও প্রচ্ছদপট মন্দ নয়।

সম্পাদক—ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক—অরুণ চক্রবর্তী
ডাঃ জ্যোতির্ময় শর্মা কর্তৃক অভ্যুদয়, ৩০, সূর্য সেন ষ্ট্রীট, কলি-৯ থেকে মুদ্রিত ও ডাঃ সোমনাথ মুখার্জি কর্তৃক
১৩২/১এ. কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত।

MANAB-MON দাম এক টাকা APRIL 1962

IMPORTANT BOOKS FROM MOSCOW

Medical Science

I. PAVLOV :	Selected Works	2·81
M. NESTURKH :	The Origin of Man	6·25
M. GRASHCENKO & LISITSYN :	Achievements of Soviet Medicine	0·50
V. ZHDANOV :	Control of Communicable Diseases in USSR	0·44
O. MAKEYEVA :	Prevention of Material & Infaul Diseases	3·12
K. BYKOV :	Text Book of Physiology	8·44
A. KOMPANEYOTS :	Theoretical Physics	8·00

Popular Science

A. FERSMAN :	Geochemistry for Everyone	4·44
L. FRIDLAND :	Paths of Science	2·81
V. FILATOV :	My Path in Science	1·25
K. TIMIRYAZEV :	The Life of the Plant	2·81
M. PRISTVIN :	Natures' Diary	1·75
M. E. BALCHISARAISEVA :	Energetics	2·50
M. VASILYEV and S. GUSHEHEV :	Reports from the Twenty First Century	3·00

NATIONAL BOOK AGENCY PRIVATE LTD.

12, BANKIM CHATTERJEE STREET, CALCUTTA-12.

172 Dharamtala Street,
Calcutta-13.

Nachan Road, Benachity,
Durgapur-4.